পঞ্চবাণ

শিল্পী—ধীরেন বল

প্রিয়ঙ্করেষু

॥ ১ ॥

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে গ্রীষ্ম তাপটা যে এমন প্রচণ্ড আকারে দেখা দিতে পারে এ যেন সত্যিই ধারণারও অতীত।

বাংলা দেশের হাওয়ায় যেন পশ্চিমের লু'র তাপ।

ঘরের জানালা দরজা সব এঁটে পূর্ণ বেগে ফ্যান চালান হ'য়েছে, তথাপি মনে হচ্ছে গা যেন ঝলসে যাচ্ছে।

সকালে এসেছিলাম কিরীটির ওখানে কিন্তু গল্পে গল্পে বেলা অনেকটা গড়িয়ে যাওয়ায় কিরীটি বাসায় আর ফিরতে দেয়নি। আহারাদির পর আটকে রেখেছে।

দ্বিপ্রহরে নিদ্রাভ্যাস আমার কোন দিনই নেই তাই ঐ দিনকার একটা সংবাদপত্র নিয়ে জানালা-দরজা-আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যেই সময় কাটাবার সৎ চেষ্টায় নিযুক্ত আছি। কিরীটি একটা আরাম কেদারার 'পরে গা এলিয়ে দিয়ে সিগার টানছে বাদশাহী মুডে দু'টি চক্ষু বুঁজে।

গরমটা এমন বিশ্রী যে, কথাবার্তা বলতেও ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ কিরীটি কথা বললেঃ এই প্রচণ্ড গরমে কে আবার এলেন ধন্য করতে।

'কি বলছিস ?—'

'কেন জুতোর শব্দ সিঁড়িতে পাচ্ছিস না ?—'

সত্যিইত !

কান পেতে শুনলাম সত্যিই মৃদু ধীর একটা জুতার শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ?

'ভদ্রলোক সৌখীন ও কেতা দুরস্ত। বিলাতী শিক্ষার আভিজাত্য আছে বলে মনে হয় !—' কিরীটি মন্তব্য করে।

'কেমন করে বুঝলি ?—'

'জুতোর শব্দ থেকেই বোঝা যায়। আমাদের সাধারণ বাঙালীদের মত মচ মচ শব্দ তুলে আসছেন না !—'

জুতোর শব্দ ততক্ষণে থেমেছে। ঘরের বন্ধ দরজায় মৃদু নক্ শোনা গেল।

'দরজাটা খুলে দে সুব্রত !—'

নাঃ জ্বালালে দেখছি। উঠে আবার জামাটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। একটু সভ্যভব্য হয়েই দরজা খোলা ভাল। কে জানে কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের মানী লোক।

দরজা খুলে দিতেই যিনি কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি কিন্তু আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

শুধু তার চেহারার মধ্যেই নয় তার বেশ-ভূষার মধ্যেও একটা রুচি ও অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা একান্ত ভাবেই যেন সুস্পষ্ট।

'মিঃ কিরীটি রায়?—' মৃদু ধার কণ্ঠে আগন্তুক প্রশ্ন করলেন।

'আমারই নাম। বসুন!—'

কিরীটির আহ্বানে আগন্তুক তার পাশেরই একটা সোফা অধিকার করে বসলেন।

'আমার নাম তেজেশ ঘোষ—হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করি!—' ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন।

বিলাত ফিরত ব্যারিস্টার। বয়েস পঁয়ত্রিশের উর্ধ্বে নয়। সুঠাম লম্বাচওড়া গৌরবর্ণ চেহারা, পরিধানে দামী শাদা সিল্কের সুট। মেরুন কালারের টাই। পায়ে দামী চক্ চকে অক্সফোর্ড সু।

'অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য আমি দুঃখিত মিঃ রায়! কিন্তু আমার প্রয়োজনটা এত বেশী যে, বিরক্ত না করে আপনাকে পারলাম না!—'

'না, না—তাতে আর কি হয়েছে!'—কিরীটি সৌজন্য প্রকাশ করে। অতঃপর ভদ্রলোকের সঙ্গে যে কথাবার্তা হলো তাতে করে তারই বিশেষ অনুরোধে জায়গার নামটা আমাদের গোপন করতে হচ্ছে।

ধরুন জায়গার নামটা মোমিনপুর—আসাম অঞ্চলে একটি ছোটখাটো বর্ধিষ্ণু শহর। এবং মোমিনপুরই বর্তমান কাহিনীর ঘটনা স্থল।

মিঃ তেজেশ ঘোষ বললেনঃ দীননাথ ঝা মোমিনপুরের থানার O. C. তারই বিশেষ অনুরোধে আপনার কাছে আসছি মিঃ রায়।

'হাঁ দীননাথের সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ, সে কেমন আছে ?—'

'ভালই !—'

'হুঁ। ব্যাপারটা কি বলুন ত ?—'

'আমার বক্তব্য পেশ করবার আগে যদি একটু মুখচন্দ্রিকা করে নিই আপনার আপত্তি আছে কি মিঃ রায় ? কেননা তাতে করে যে জন্য আপনার কাছে আমার আসা সেটা আপনার সহজ বোধ্য হবে !—'

'নিশ্চয়ই না, বলুন !'—মৃদু হেসে কিরীটি জবাব দেয়।

'মোমিনপুর আসামের একটা ছোটখাটো স্টেট। এবং স্টেটের রাজা হচ্ছেন টিকেন্দ্রজিৎ বড়ুয়া। টিকেন্দ্রজিৎ আমার বছর চারেকের বড়ই হবেন। সম্পর্কে তিনি আমার ভগ্নীপতি হন। অর্থাৎ আমার একমাত্র ভগিনী সুনন্দাকে বিবাহ করেছেন।—' ব্যারিষ্টার সাহেব বলতে লাগলেন।

'তারপর ?—'

'বছর দশেক আগে টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে আমার বোন সুনন্দার বিবাহ হয়। এবং বিবাহের তিন বৎসর পরে হয় তাদের দু'টি যমজ পুত্র সন্তান রুণু আর বেণু! কিন্তু দুর্ভাগ্য রুণু ও বেণুর যখন পাঁচ বৎসর বয়েস তখন হঠাৎ সুনন্দা অসুস্থ হ'য়ে

পড়ল। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। ফলে তাকে একেবারে শয্যাশায়িনী হ'তে হলো। রুণু ও বেণুর দেখা শোনার জন্য অবিশ্যি একজন দাই ও দু'জন ভৃত্য ছিল কিন্তু সুনন্দার সেটা মনঃপূত না হওয়ায় তারই বিশেষ অনুরোধে একজন গভর্নেসের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো! বিজ্ঞাপনের ফলে অনেকগুলো দরখাস্ত আমরা পাই এবং তার মধ্যে একটি এ্যাংলো ক্রিশ্চান মেয়েকে আমিই interview নিয়ে কলকাতায় বসে সিলেক্ট করে, ওখানে পাঠিয়ে দিই। মেয়েটির নাম মিস্ ডরোথি জোন্স। ডারোথির বয়েস চব্বিশ পঁচিশ হবে এবং মেয়েটি যে কথায়-বার্তায়ই শুধু চটপটে তাই নয়, শিক্ষিতা ও মার্জিত রুচিসম্পন্না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও অত্যন্ত soft hearted বলেই মনে হয়!—' এই পর্যন্ত বলে তেজেশ একটু থামলেন।

বুক পকেট হ'তে একটা শাদা হাতীর দাঁতের সুদৃশ্য সিগারেট কেস বের করে প্রথমেই কিরীটিকে অফার করলেন ঘোষ সাহেব।

কিরীটি মৃদু হেসে নড্ করে বললেঃ No thanks! সিগারটাই আমি বেশী পছন্দ করি।

'I see!—' তেজেশ একটা সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে কয়েকটা মৃদু টান দিয়ে বললেনঃ মিস্ ডরোথিকে পাঠিয়ে দিলাম এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়ে টিকেনের ওখানে, এবং একমাস পরে রিপোর্ট পেলাম টিকেন নিজেত বটেই সুনন্দাও নাকি ডরোথির কাজে ও ব্যবহারে অত্যন্ত মানে highly pleased.

'If you don't mind একটা কথা মিঃ ঘোষ, কত মাহিনা ঠিক হয়েছিল মিস জোন্সের ?—' কিরীটি হঠাৎ প্রশ্ন করে।

'Oh। it was a handsome salary. মাসে চারশ টাকা ও খাওয়াপরা !—'

'হুঁ ! তারপর ?—'

'তারপর বছরখানেক নির্বিবাদেই কেটে গেল ! এমন সময় হঠাৎ গত মঙ্গলবার মানে দিন সাতেক আগে টিকেনের এক তার পেলাম, রুণু ও বেণু seriously ill—বড় একজন ডাক্তার নিয়ে সত্বর যাবার জন্য। ডাঃ সান্যালকে নিয়ে গেলাম কিন্তু যেদিন পৌঁছালাম বেলা দশটায়—তার ঘণ্টাখানেক আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে। রুণু ও বেণু মারা গিয়েছে—Peculiar death. ধীরে ধীরে cyanosis হ'য়ে মারা গিয়েছে। জ্বর নেই জ্বালা নেই চার পাঁচদিন ধরে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। Symptoms শুধু cyanosis, ডাক্তার সান্যালই মৃতদেহ দেখে সর্বপ্রথম সন্দেহ করলেন, death was not natural—স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। There must be some foul play !—' তেজেশ আবার থামলেন।

কিছুক্ষণ আবার একটা স্তব্ধতা।

কিরীটিই আবার প্রশ্ন করেঃ তারপর ?

'তারপর ডাঃ সান্ন্যালের কথামতই থানার O. C. কে সংবাদ দেওয়া হলো। গৌহাটি থেকে civil surgeon'ও এলেন। ময়না তদন্তে প্রকাশ পেল Nitro benzene বিষে মৃত্যু ঘটেছে !

কিন্তু কেমন করে কি ভাবে এবং কার দ্বারা যে, ঐ মারাত্মক বিষ ওদের শরীরে সংক্রামিত করা হলো সেটা হাজার চেষ্টা করেও জানা গেল না। এই দুর্ঘটনায় টিকেনত সাংঘাতিক ভাবে মুষড়ে পড়েছেই! বেচারী ডরোথ পর্যন্ত ভয়ানক shocked হয়েছে, poor girl নিজের সন্তানের মত করেই ছেলে দু'টোকে মানুষ করছিল। ওদের অসুস্থ হওয়ার পরও পাঁচ দিন এক মিনিটের জন্যও ওদের শয্যার পাশ থেকে উঠে কোথায়ও যায়নি। এমন কি স্নানাহার পর্যন্ত তার বন্ধ ছিল বললেও হয়, আর সুনন্দার কথা কি বলবো সেত সংবাদটা শোনা অবধি এখনো ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছে। তার অবস্থা অবর্ণনীয়। অল্প বয়েসেই সুনন্দা শয্যাশায়িনী হ'য়ে পড়ায় সে নিজে এবং আমরাও সকলেই বহুবার টিকেন্দ্রজিৎকে আবার বিবাহ করতে বহু অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু আমাদের কারো কথাতেই সে কর্ণপাত করেনি, বরাবরই সে বলেছে রুণু ও বেণুইত তার আছে। তারা বেঁচে থাকলেই তার সব কিছু পাওয়া হবে!—'

'টিকেন্দ্রজিতের স্টেটের আয় বাৎসরিক কত হবে বলে আপনার অনুমান মিঃ ঘোষ?—' কিরীটিই প্রশ্ন করে।

'তা ধরুন বৎসরে দেড় লাখত হবেই, Quite a big state!—'

'আচ্ছা সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন টিকেন্দ্রজিতের দুই পুত্রইত আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেল। এখন ন্যায়ত তার সম্পত্তির আর কোন উত্তরাধিকারী আছে কি?—'

[illegible] জানি টিকেন যদি কোন উইল না করে যায়ত তার এক দাদা আছেন, বৈমাত্রেয় ভাই রাজেন্দ্র বড়ুয়া—তিনিই সব কিছুর মালিক হবেন।'

'তিনি কি করেন ?—'

'তাঁরও অবস্থা ভাল তবে টিকেনের মত নয়। গৌহাটিতে তার মস্তবড় টিক্ উডের ব্যবসা আছে।'

'তিনি টিকেন্দ্রজিতের চাইতে বয়সে বড় না ছোট ?—'

'বড়। বছর সাতেকের বড়।—'

'বরাবরই কি তিনি টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে আলাদা ?—'

'হাঁ! রাজা রণজিৎ বড়ুয়া, ওদের বাপ বেঁচে থাকতেই দু'জনকে সব পৃথক ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ঐ সময় টিকেনের মা রাজার ছোট স্ত্রী জীবিতা থাকায় টিকেনের share-টাই ভারী হয় ভাগে।'

'টিকেন্দ্রজিতের দাদা রাজেন্দ্র বড়ুয়ার সংসারে কে কে আছেন ?—'

'তাঁর স্ত্রী ও এক মেয়ে। মেয়েটির বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে। প্রচুর খরচ করে লণ্ডন ইউনিভারসিটির কেমিস্ট্রিতে ডক্‌ট্রেট্ ছেলের সঙ্গে একমাত্র মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র বড়ুয়া, কিন্তু জামাইটি তেমন সুবিধার হয়নি। প্রচণ্ড মাতাল ও জুয়াড়ী। প্রথম দিকটায় প্রশান্ত মানে রাজেন্দ্রর জামাইকে অনেক শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন রাজেন্দ্র কিন্তু কিছুই ফল হলো না। শেষটায় প্রশান্তকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন রাজেন্দ্র।—'

'আর মেয়ে ?—'

'মেয়ে নীলা বাপের কাছেই আছে।—'

'এখন বলুন আমার কাছে দীননাথ আপনাকে পাঠিয়েছে কেন ?—'

'পূর্বেইত বললাম রুণু ও বেণুর আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা একান্ত রহস্যজনক। কিন্তু দীননাথবাবু রহস্যের কোন কিনারাই করতে পারছেন না। তাই তিনিই আপনার নাম করে আমাকে এখানে আসতে বলেছেন। তাঁরও ইচ্ছা, আমাদেরও ইচ্ছা এবং বিনীত অনুরোধ, এই ব্যাপারে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনার ফিস্ যা লাগে অবশ্যই আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।—'

'কিন্তু—'

'না মিঃ রায়। আপনার কোন আপত্তিই আমরা শুনবো না। যেমন করে হোক এ মৃত্যু রহস্যের কিনারা আপনাকে করে দিতেই হবে। আপনার সম্মতি না নিয়ে আমি উঠ্‌বো না!—'

'দেখুন মিঃ ঘোষ! তাহ'লে—আপনাকে আমি খুলেই বলি। কেসটা হাতে নিতে আমার আপত্তি নেই যদি রাজা টিকেন্দ্রজিৎ —'একটু থেমে কিরীটি কথাগুলো বললে।

'ওঃ নিশ্চয়ই, হাজারবার। টিকেনের সম্মতিক্রমেই ত আমি এখানে এসেছি। এবং আমিই সঙ্গে করে আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবো!—'

'বেশ! তবে আর দেরীর প্রয়োজন নেই! আজ রাত্রে

যদি যাবার ব্যবস্থা করতে পারেনত আজই আমি যেতে প্রস্তুত আছি—'

'না। আজ আর হবে না। কাল আসাম মেলেই আমরা রওনা হবো।'

'বেশ। তাই হবে!—'

অতঃপর তেজেশ বিদায় নিলেন।

ইতিমধ্যে রৌদ্র পড়ে গিয়েছিল। আমি ঘরের জানালাগুলো খুলে দিলাম।

জংলী ট্রে'তে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে কক্ষে প্রবেশ করল। পশ্চাতে কৃষ্ণা। তার হাতে ট্রে'র 'পরে নিজের হাতে তৈরী প্লাম কেক্।

জংলীর হাত হ'তে ট্রেটা ত্রিপয়ের 'পরে নামিয়ে কাপে চা ঢালতে ঢালতে কৃষ্ণা বললে : কি এমন রাজকার্য নিয়ে মেতে উঠেছিলে বলত! সাড়ে পাঁচটা বেজে যায় অথচ চায়ের তাড়া নেই। অন্যদিন যে সাড়ে তিনটে বাজতে না বাজতেই চা'য়ের তাগিদ-লাগে।

'রাজকার্যই বটে। কাল আসাম মেলে বাইরে চলেছি। দিন দশেকের মত বাইরে হয়ত থাকবো। ব্যবস্থাটা একটু করে রেখো!—' কিরীটি চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে একটুকরো কেকে কামড় দিতে দিতে জবাব দেয়।

'আসাম !—হঠাৎ ?—'

'হঠাৎই বটে। সত্যান্বেষণের ব্যাপার !—'

'আমিও তবে সঙ্গে যাবো !—'

'উহুঁ! মনীষীরা বলে গিয়েছেন পথে নারী বিবর্জিতা। অতএব হে নারী! তোমারত যাওয়া হ'তে পারে না !—'

'না। তাই বইকি! একা একা আমি এই কলকাতার গরমে সিদ্ধ হবো আর ওনারা যাবেন আসাম—ও সব চলছে না !—'

'ঠিক বলেছো বৌদি ভাই! তা চলবে না। তুমিও যাবে।—' বললাম আমি।

'হাঁ। একে মা মনসা তার উপর দাও ধূপের ধোঁয়া—' কিরীটি বললে।

খ

যাহোক শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য কলহ না ঘটিয়েই এবং আসাম হ'তে প্রত্যাবর্তন করেই দার্জিলিং যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিরীটি ও আমি মোমিনপুর এসে পৌঁছালাম।

উত্তর ও পশ্চিমে অরণ্য ও দক্ষিণে পর্বত বেষ্টিত সত্যি ছবির মতই শহরটি। শহরটির উন্নতি কল্পে স্টেটের কোন কার্পণ্য নেই দেখলাম। চমৎকার রাস্তা ঘাট। বাসিন্দাও কম নয়। আবহাওয়াও কলকাতা হ'তে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। রাত্রের দিকেত গায়ে কিছু না চাপা দিলে বেশ শীত শীতই করে।

শহরের একপ্রান্তে একেবারে রাজবাড়ি! পূর্বপুরুষের আমলের সেকেলে প্রাসাদের অল্প দূরেই আধুনিক আমেরিকান স্ট্রাকচারে তৈরী নবনির্মিত রাজপ্রাসাদ।

গেট পার হলেই নুড়ি ঢালা প্রশস্ত পথ একেবারে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দু'পাশে মেহেদীর কেয়ারী তাকে জড়িয়ে উঠেছে লাজ নম্র বধূর মত মাধবী লতা।

দু'পাশে বাগান। অজস্র দেশী বিদেশী ফুলের বিচিত্র রঙীন সমাবেশ। একপাশে টেনিস লন। অন্যদিকে আস্তাবল ও গ্যারাজ। ল্যাণ্ডো গাড়ি ওয়েলার অশ্বযুক্ত এবং দামী আমেরিকান কার দুইয়েরই ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া রাজা

টিকেন্দ্রজিতের অশ্ব চালনা প্রীতির জন্য ভাল ভাল চার পাঁচটি অশ্বও আছে।

প্রকাণ্ড তিন তলা বাড়ি।

নিচের তলাতেই একটা প্রকাণ্ড সুসজ্জিত কক্ষে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

স্টেশনে গাড়ি নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন রাজার পার্শোন্যাল সেক্রেটারী মণিময় গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলী মশাইয়ের বয়স পঞ্চাশের প্রায় কাছাকাছি।

বলিষ্ঠ কর্মঠ পুরুষ। গত বার বৎসর ধরে রাজা টিকেন্দ্রজিতের কাজে নিযুক্ত আছেন।

বেলা এগারটা নাগাদ আমরা প্রাসাদে পৌঁছেছিলাম, তিনি আমাদের বিশ্রামের ও আহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে এবং সর্বদা আমাদের আবশ্যকীয় ফুট ফরমাস্ খাটবার জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করে বিদায় নিলেন এবং ব্যারিস্টার ঘোষ সাহেবও ভিতরে চলে গেলেন।

আসবার পথেই ট্রেণে ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আলাপ পরিচয় জমে উঠে—চমৎকার অমায়িক সাদা সিধে লোক। মনের মধ্যে কোথাও ঘোর-প্যাচ নেই। উচ্চবংশের সন্তান। এবং এককালে অবস্থা খুব ভাল থাকলেও ইদানীং দুই পুরুষে অবস্থাটা খুবই খারাপ হ'য়ে পড়ে।

তবে অতীতের অর্থের প্রাচুর্যে টানাটান পড়লেও রূপের প্রাচুর্যে টানাটানি পড়েনি। এবং সেই রূপের জৌলুসেই তার বোন এঘরে স্থান পেয়েছিলেন পুত্রবধূর মর্যাদায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বেশী দিন সেটাও সহ্য হলো না।

তেজেশের বিলাত যাবার যাবতীয় খরচ ও বারে তাকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সমস্ত খরচ এখনো ভগ্নীপতি টিকেন্দ্রজিতই দিয়ে আসছেন।

টিকেন্দ্রজিৎ তেজেশকে নিজের সহোদর ভাইয়ের মতই স্নেহ করেন ও ভালবাসেন।

টিকেন্দ্রজিৎ লোকটি নিজেও উচ্চ শিক্ষিত এবং অত্যন্ত আধুনিক মনোভাবাপন্ন। দান-ধ্যানও তার প্রচুর।

তার অমায়িক দিলখোলা স্বভাবের জন্য সকলেই তাকে যথেষ্ট ভালবাসে এবং তার পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয় সকলেই বিশেষ দুঃখিত।

সমস্ত দ্বিপ্রহরটা একটানা বিশ্রাম নেওয়ার পর দু'জন আমরা ঘরে বসে খোস গল্প করছি রাজা টিকেন্দ্রজিতের খাস ভৃত্য রামচন্দ্র এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল : রাজা সাহেব সেলাম দিয়েছেন আপনাদের।

আমরা আর দেরী না করে প্রস্তুত হ'য়ে নিলাম রাজ দর্শনের জন্য।

দামী ঈজিপসীয়ান কার্পেটে মোড়া চওয়া সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা ভৃত্যের পিছনে পিছনে দ্বিতলে উঠলাম। দীর্ঘ

টানা একটা বারান্দা। বারান্দাটা আগাগোড়া ইটালিয়ান মার্বেল পাথরে মোড়া এবং রেলিংয়ের ধার ঘেঁসে সুদৃশ্য জয়পুরী টবে টবে নানা জাতীয় পামট্রি বসান। অন্য একধারে বিরাট এক খাঁচায় এক ঝাঁক্ মনুয়া পাখী কিচির মিচির করছে। দাঁড়ে একটা লালমোহন। আমাদের বারান্দায় দেখেই লালমোহন পাখীটা বলে উঠ্‌লো : কে রে ? কে ?

মৃদু হেসে আমরা এগিয়ে চললাম।

বারান্দার শেষ প্রান্তে ছাতে কাচের একটা ঘর।

ঘরটার ছাতে ফার্ণ লতিয়ে লতিয়ে একটা সবুজের আচ্ছাদন দিয়েছে, সেই কাচের ঘরের দরজার ঝুলন্ত ভারী সবুজ বর্ণের পর্দাটার সামনে এসে রামচন্দ্র বললে : ভিতরে যান। রাজা সাহেব ভিতরেই আছেন।

পর্দা তুলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম।

চক চকে মসৃণ কালো মার্বেল পাথরের মেঝে। চার পাশে টবে নানা জাতীয় ফুলের গাছ ও পামট্রি।

বেতের একটা টেবিল একধারে পাতা। এবং তার চারপাশে খান চার পাঁচ বেতের চেয়ার। তারই একটা অধিকার করে বসে আছেন মধ্যবয়সী এক পুরুষ। পরিধানে শাদা সিল্কের পায়জামা ও অনুরূপ একটি ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী গায়ে।

দেহের বর্ণ কালো হলেও কালোর উপরে অমন সুশ্রী নিখুঁত চেহারা সচরাচর বড় একটা চোখে পড়ে না।

ব্যারিস্টার সাহেবের মুখেই শুনেছিলাম রাজা টিকেন্দ্রজিতের

বয়স চল্লিশের উর্ধ্বেই হবে কিন্তু চেহারার চমৎকার বাঁধুনী দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশের উপরে নয় বুঝি। খাঁড়ার মত নাক। প্রশস্ত কপাল। চওড়া যুগ্ম রোমশ ভ্রু। কোঁকড়ান চুল ব্যাকব্রাশ করা। দৃঢ় বদ্ধ চোয়াল। চাপা ওষ্ঠ। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে ক্ষৌরী করা।

রাজা সাহেবের পায়ের নীচে একটা রোমশ ককার-স্প্যানিয়াল পায়ের পরে মুখ গুঁজে বসে। এবং ডান পাশে বসে বোধ করি ডরোথি। গায়ের রং খুব কটা না হলেও বেশ ফর্সা! পাতলা ছিপ্ ছিপে গড়ন। মুখখানা একটু লম্বাটে ধরনের। টানা পাতলা ভ্রু। ছোট কপাল। নাকটা সামান্য একটু ভোঁতা। পটল চেরা না হলেও চোখ দু'টি সুন্দর: পিঙ্গল চক্ষু তারকা। ধারালো চিবুকের নীচে কালো একটি তিল। লিপস্টিক্ রঞ্জিত ওষ্ঠ দু'টি পাতলা। সমস্ত চোখে মুখে একটা সংযত দৃঢ় বদ্ধ ভাব। পরিধানে বিলাতী বেশভূষা। রাজা সাহেবের অন্যদিকে বসে ব্যারিস্টার সাহেব।

আমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে ব্যারিস্টার সাহেবই আহ্বান জানালেন: আসুন মিঃ রায়।

এবং ব্যারিস্টার সাহেবই আমাদের রাজা টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন: ইনি মিঃ কিরীটি রায়—। মিঃ সুব্রত রায় ওর সহকর্মী ও বন্ধু। রাজা বাহাদুর টিকেন্দ্রজিৎ বড়ুয়া। আর ইনি মিস্ ডরোথি জোন্স।

রাজা সাহেব হাত তু'লে নমস্কার জানালেন।

মিস্ ডরোথি জোন্স হাত বাড়িয়ে দিলেন : How do you do !

পরিচয়াদি, নমস্কার ও প্রতি নমস্কারের পালা সাঙ্গ হবার পর রাজা সাহেবেরই নির্দেশে আমরা দু'জনে দু'খানা খালি চেয়ার অধিকার করে বসলাম।

ইতিমধ্যে ভৃত্য ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম ও চায়ের আনুসাঙ্গিক প্রচুর পরিমাণে এনে সামনের বেতের টেবিলটার উপরে নামিয়ে রাখল। মিস ডরোথি সঙ্গে সঙ্গে উঠে প্লেটে কাপ সাজিয়ে চা তৈরী করতে লাগলেন। চা পানের সঙ্গে সঙ্গে মামুলী কথাবার্তা চলতে লাগল। দেখলাম রাজা সাহেব যেমন বিনয়ী তেমনি ধীর শান্ত। খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন। চা পানের পর মিস্ ডরোথি জোন্স বিদায় নিলেন। রইলাম আমরা চারজন। টেবিলের উপরে সুদৃশ্য হাতীর দাঁতের তৈরী একটি সিগারেট কেস ছিল। সেটা হাতে নিয়ে কেসটির ঢাকনা টিপে খুলে রাজা সাহেব সর্বপ্রথমে কিরীটির দিকে এগিয়ে দিলেন।

কেস ভর্তি ইজিপসিয়ান স্পেশ্যাল ব্রাণ্ড সিগ্রেট।

কিরীটি নিজের সিগার প্রীতির কথা জানিয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে মৃদু হেসে প্রত্যাখ্যান জানাল ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের সিগার কেসটি বের করল। আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম : অভ্যাস নেই। দু'এক সময় কখনো সখনো শখ করে এক আধটা খাই।

অতঃপর রাজা সাহেব নিজে একটি নিয়ে শ্যালককে একটি দিলেন।

সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করে কয়েকটা মৃদু টান দিয়ে মৃদু কণ্ঠে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ বললেন : মিঃ রায়, তেজুর মুখে সবই নিশ্চয় শুনেছেন। Unexpected rude shock! কল্পনাতীত! এও বোধ হয় আপনি শুনেছেন আমার স্ত্রী বহুদিন যাবৎ রুগ্না ও একেবারে শয্যাশায়ী। আমার চাইতে এই দুর্ঘটনায় আঘাতটা তারই বেশী লেগেছে।

কথাগুলো বলতে বলতে রাজ টিকেন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন ভারী হ'য়ে এলো। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরালেন তিনি, মুখের পেশীগুলো ও চোয়ালটা দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে ওঠে ভাবাবেগটা সংযত করবার প্রচেষ্টায়। টিকেন্দ্রজিৎ প্রাণপণে নিজেকে দমন করবার প্রয়াস পাচ্ছেন বোঝা গেল।

সূর্য অস্ত গিয়েছে। ম্লান বিষণ্ণ বৈকালী ছায়া ঘনিয়ে উঠ্ছে চারিধারে।

আবার কথা বললেন টিকেন্দ্রজিৎ তেমনি সংযত মৃদু শান্ত কণ্ঠস্বর : এত বড় দুর্ভাগ্য যে আমার ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে উঠ্ছে সাতদিন আগেও আমি তা টের পাইনি মিঃ রায়। শিকারে যাবার দিন দুই আগে ওদের গভর্নেস মিস্ জোন্স অবিশ্যি আমায় বলেছিল কিছুদিন ধরে বাচ্চাদের শরীর নাকি ভাল যাচ্ছে না। তাকে বলে গেলাম স্টেটের ডাক্তার বংশীধরকে যেন একবার ডেকে ওদের দেখান হয়।

'দেখান হয়েছিল ডাক্তার?—' প্রশ্ন করলে কিরীটি।

'হাঁ! পরে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম সে নাকি তাদের শরীরে বিশেষ কোন definite organic defects পায়নি তবে—'

কিরীটি প্রশ্ন করল—'তবে ?—'

'বেশ একটু anæmia রক্তাল্পতা ছিল!—আর তখনই cyanosis-এর লক্ষণ নাকি ওদের দুজনারই শরীরে একটু একটু প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু শরীরে ওদের cyanosis-এর কোন উপসর্গ খুঁজে না পাওয়ায় তখন ব্যাপারটা তেমন seriously নেয়নি—'

'আপনি বুঝি ঐ সময়ে শিকারে গিয়েছিলেন ?—'

'হাঁ। সাধারণতঃ এই সময়ে আমি শিকারে যাই না। কিন্তু কলকাতা হ'তে আমার এক বন্ধু এসেছিল। সে বিশেষ করে ধরায় শিকারে যেতে হয়েছিল। দিন চারেক বাইরে ছিলাম। এমন সময়ে কুমাররা অসুস্থ হয়ে পড়ায় মিস্ জোন্স ও মণিময় আমার কাছে স্পেশাল ম্যাসেনজার পাঠিয়ে দেয়। সংবাদ পেয়েই আর আমি দেরী করি না। ঘোড়ায় চেপে ভোর নাগাদ ফিরে আসি। এসে দেখলাম কুমারদের অবস্থা খুবই খারাপ। সঙ্গে সঙ্গে গৌহাটিতে সিভিল সার্জেনকে কল দিই ও কলকাতায় তেজুকে তার করে দি একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে অবিলম্বে চলে আসবার জন্য।—' বলতে বলতে টিকেন্দ্রজিৎ একটু আবার থামলেন। এবং অন্যমনস্ক হ'য়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন কিছু ভাবছেন।

ঘটনাটা রাজা টিকেন্দ্রজিতের মনে বিশেষ দাগ কেটেছে। এব
বুঝতে পারছিলাম বলতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার টিকেন্দ্রজিৎ বলতে লাগলেন, 'ডাঃ বংশীধর, ও সিভিল সার্জেন দু'জনে সমস্তটা দিন ও সারাটা রাত ধরে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন কিন্তু দুর্ঘটনাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। সকাল নয়টা নাগাদ সব শেষ হয়ে গেল। ভেজু ডাঃ সান্যালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল—তিনিই সব দেখে ও রোগ ও লক্ষণের ইতিহাস শুনে সর্বপ্রথম মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনিই বললেন কুমারদের মৃত্যুর ব্যাপারটা নাকি স্বাভাবিক নয়। সিভিল সার্জেনও তখন বললেন, গোড়া থেকে তারও নাকি সেই রকমই একটা সন্দেহ হচ্ছিল মনে। তীব্র কোন বিষের ক্রিয়াতে মৃত্যু ঘটেছে। ডাঃ সান্যাল ও সিভিল সার্জেনের পরামর্শ মতই তখন আমি কতকটা বাধ্য হয়েই থানায় সংবাদ পাঠাই। দীননাথ ঝা সংবাদ পেয়েই এলেন। এবং মৃতদেহ দুটির ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হলো। এবং শেষ পর্যন্ত ময়না তদন্তের দ্বারাই সব জানা গেল। বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু! Nitrobenzene is responsible for the death. ময়না তদন্ত ও ক্যামিক্যাল এ্যানালিসিসে যখন কুমারদের মৃত্যুর কারণ নাইট্রোবেনজিন বিষই ধার্য হয়েছে তখন সে সম্পর্কে আর কারোই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না অবিশ্যি। এবং আমারও নেই মিঃ রায়। কিন্তু আমার বোধগম্যের বাইরে যেটা সেটা হচ্ছে কি উপায়ে এবং কার দ্বারাই বা সেই ভয়ানক বিষ

কুমারদের দেহে সংক্রামিত হলো আর কেনই বা হলো?
অথচ ভেবে দেখতে গেলে সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে,
কুমারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যারা ছিল তারা ছাড়াত আর কেউই
তাদের বিষ প্রয়োগ করতে পারে না। কারণ আমার কঠিন
নির্দেশ ছিল কুমাররা যেন কখনো কোন কারণেই প্রাসাদের
বাইরে না যায়। বিকালে একবার করে গাড়িতে চাপিয়ে
কুমারদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'তো—সঙ্গে থাকতো ওদের
প্রাইভেট্ টিউটার ধরণীধর চালিহা। তারই হেফাজতে থাকতো
কুমারেরা। কিন্তু ধরণীধরকে বলাই ছিল কোথাও গাড়ি থামিয়ে
যেন ওদের গাড়ি থেকে না নামাতে দেওয়া হয়। এত সতর্ক
আমি ছিলাম মিঃ রায়। বিশেষ করে ওদের মা অসুস্থ থাকায়
সর্বদা ওদের পরে আমার খুব বেশীই সজাগ দৃষ্টি ছিল। তবু।
দেখুন কোথা দিয়ে কী হ'য়ে গেল।—'

'ঐ বৈকালিক বেড়াবার সময় ছাড়া কুমাররা কি কখনো
অন্দর মহল থেকে বের হতো না?—' প্রশ্ন করলে কিরীটি।

'না! ওদের থাকা খাওয়া শোওয়া খেলা পড়াশুনা করবার
সমস্ত ব্যবস্থাই প্রাসাদ অন্দরে করে দিয়েছিলাম। ওদের পড়া,
শুনা, খেলা খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা পর পর পাশাপাশি তিনটি
ঘরে ছিল একেবারে ওদের মা যে ঘরে থাকেন তারই পাশে।—'

'কুমারদের দৈনন্দিন জীবনের রুটিনটা আমাকে একবার
বলবেন রাজা সাহেব?—' কিরীটি প্রশ্ন করে।

রাজা টিকেন্দ্রজিৎ ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বললেন: সকালে

উঠে বেলা সাতটায় ওরা ধরণীর কাছে পড়তে যেতো. প্রাতঃরাশ শেষ করে। সাড়ে নয়টায় পড়া শেষ করে ওদের খেলাঘরে যেতো খেলতে। ঐ সময় সঙ্গে থাকত মিস জোন্স! সকাল সাড়ে দশটায় স্নান সেরে আহারাদি করে বেলা বারটা পর্যন্ত বিশ্রাম। বারটা থেকে বেলা দু'টো পর্যন্ত ওদের পড়বার ঘরের পাশেই একটা ছোট ঘরে লাইব্রেরী করে দিয়েছিলাম, সেখানে বসে ইচ্ছামত ওদের পড়াশুনা বা ছবি আঁকতো। দু'টো থেকে তিনটে পর্যন্ত থাকতো ওদের মায়ের কাছে মায়ের ঘরে। তিনটে থেকে চারটের মধ্যে ওদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বৈকালিক জলখাবার খাওয়াতো মিস্ জোন্স। সাড়ে চারটের সময় গাড়িতে চেপে ওদের টিউটার ধরণীর সঙ্গে বাইরে যেতো বেড়াতে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ধরণীর কাছে পড়াশুনা করতো। আটটায় খেয়ে শুতে যেতো। শয়নের পর যতক্ষণ না তারা ঘুমাতো মিস্ জোন্স ওদের কাছে কাছেই থাকতো।

'আর একটা কথা। কুমারদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ এবাড়ির মধ্যে কারা কারা ছিল ?—'

'বললাম ত। আমি, আমার স্ত্রী, মিস্ জোন্স, টিউটার ধরণীধর চালিহা, ওদের পার্সোন্যাল চাকর মাণিক ও ছোট বেলার দাইমা নলিনী।—

'কিছু যদি মনে না করেনত আর একটা প্রশ্ন করি রাজা সাহেব ?—'

'বলুন ?'

'এই ধরণীবাবু, মিস্ জোন্স, মাণিক ও নলিনী এরা কে কতদিন ধরে এই প্রাসাদে আছে ?—'

'প্রকৃতপক্ষে নলিনী ত ওদের জন্মাবার সময় থেকেই কুমারদের দেখা শুনা করে আসছে। তা ধরুন নয় বছর ত হবেই। মাণিকও আছে তা প্রায় বছর সাতেক। আর মিস্ জোন্স এসেছেন আমার স্ত্রীর অসুস্থ হবার মাস ছয়েক বাদে, তাও চার বছরের উপরে।—'

'এদের মধ্যে কে কত মাইনা পেত ?—'

'খোরাক পোশাক বাদে যতদূর জানি মাণিক ৫০৲ টাকা। নলিনী—১০০৲। ধরণীধর দেড়শত টাকা ও মিস্ জোন্স সাড়ে চারশটাকা পান!—'

'কিছু মনে করবেন না রাজা সাহেব, এদের মানে এই মাণিক, নলিনী, ধরণীবাবু ও মিস্ ডরোথি জোন্স এদের মধ্যে কাউকে আপনার কোন রূপ সন্দেহ হয় ?—'

কিরীটির প্রশ্নে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ ওর মুখের দিকে তাকালেন। তার চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশ্ন যেন এক সঙ্গে ফুটে ওঠে।

'আপনি কি এদেরই কাউকে এ ব্যাপারের সন্দেহ করেন মিঃ রায় ?—'

রাজার প্রশ্নে মৃদু হেসে কিরীটি অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে জবাবে বললে,

'দেখুন রাজা সাহেব। কথাটা ঠিক তা নয়। রহস্যো-

দ্ঘাটনের ব্যাপারে আমাদের মন যতক্ষণ না একটা স্থির মীমাংসায় পৌঁছায়, অকুস্থানের আশেপাশে যারা ছিল বা থাকে তাদের প্রত্যেকের পরেই ততক্ষণ সন্দেহ আসে ; তাদের স্বভাব চরিত্র, গতিবিধি সব কিছুই আমাদের জানবার প্রয়োজন হয়। অবিশ্যি তার মানে এও নয় যে, সন্দেহ কাউকে করছি বলেই সত্যিকারের সে দোষী হবে।—'

রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে শান্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'না আমার কারো উপরেই সন্দেহ হয় না। আর হবেই বা কেন বলুন। কুমারদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করবার ওদের চারজনের কার কি এমন স্বার্থ থাকতে পারে। আপনারা বলেন মোটিভ্ ছাড়া হত্যা হয় না কিন্তু আমিত ভেবেই পাচ্ছি না ওদের কারো কোন মোটিভ্ থাকতে পারে ?—'

'একদিক দিয়ে অবিশ্যি আপনার কথা আমি অস্বীকার করতে পারছি না। তবে এমন কথাও আপনি জোর করে বলতে পারেন না যে, সত্যি সত্যিই ওদের চার জনের কারো কোন মোটিভই থাকতে পারে না এ ব্যাপারে। কার স্বার্থ যে কিসে এবং এ জগতে মানুষ কে যে কী জন্য কি করে বা করতে না পারে এ বোঝা সত্যিই কঠিন।—কিন্তু সে কথা যাক। এ ব্যাপারে অর্থাৎ এদের মধ্যে চারজনের কাউকে সন্দেহের ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর মানে রাণী সাহেবেরও মতামত কি তাই ?'

একটু যেন জোর একটু যেন দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে অতঃপর রাজা সাহেব বললেন।

'সুনন্দার কথা আমি বলতে পারি না মিঃ রায়। তবে আমার মনে হয় আমার সঙ্গে সে দ্বিমত হবে না।'

'একটা কথা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে রাখি—যদি আমার প্রয়োজন হয় এবং আপনার স্ত্রীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় তাহ'লে আপনার কোন অমত হবে নাত !—'

'নিশ্চয়ই না। তাছাড়া সুনন্দা জানে যে আপনারা এই ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য প্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। তেজুই তাকে জানিয়েছে !—'রাজা বললেন।

কথা বললেন এবারে ব্যারিস্টার তেজেশ ঃ হ্যাঁ। নন্দাকে বলেছি আমি আগেই আপনাদের কথা।

'কি তিনি বললেন ?'

'হাঁ বা না কিছু বলেনি বটে তবে তার যে খুব বেশী অমত নেই তা বোঝা গেল !—' ব্যারিস্টার তেজেশ জবাব দিলেন।

কিরীটিই এবারে ব্যারিস্টার সাহেবকেই প্রশ্নটা করলে ঃ কিসে বুঝলেন সে কথা ?

মৃদু হেসে ব্যারিস্টার জবাব দিলেন ঃ ভুলে যাচ্ছেন কেন মিঃ রায় নন্দা তাদের মা। এতবড় নৃশংস ব্যাপারকে কি সে অত সহজেই ক্ষমা করতে পারে ?

জবাবে কিরীটি মৃদু হাসলো মাত্র। কোন জবাব দিল না।

এমন সময় রাজভৃত্য রামচন্দ্র এসে কক্ষের আলো জ্বালিয়ে দিল। প্রাসাদে রাজার নিজস্ব ডায়নামোতে সবত্র বিজলী আলোর ব্যবস্থা আছে।

ইতিমধ্যে কখন একসময় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হ'য়ে এসেছিল টেরই পাইনি। আলো আসায় তবে খেয়াল হলো।

রামচন্দ্র রাজার সামনে এসে বললে: মহারাজ! মেম সাহেব বললেন আপনার সন্ধ্যা-গোশলের সময় হ'য়ে গিয়েছে।

রামচন্দ্রের কথায় রাজা উঠে পড়ে বললেন: উঃ সত্যি। সাড়ে ছটা বেজে গিয়েছে। আপনারা কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম আমার দু'বেলাই স্নান করা অভ্যাস।

'হাঁ! নিশ্চই যান আপনি!—'

রাজা যেতে যেতে বললেন, 'তেজু রইলো। যা কিছুর আপনাদের প্রয়োজন মিঃ রায় তেজুকে বলেই ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

টিকেন্দ্রজিৎ অতঃপর কক্ষ হ'তে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ আবার স্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ কথা বললেন তেজেশ: সত্যি মিঃ রায়, ডরোথির ঋণ আমরা কোন দিনই শোধ করতে পারবো না। এই এত বড় শোকের সময় ডরোথি যদি টিকেনের পাশে পাশে না থাকতো ও বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতো। শুধু কি টিকেনের দিকেই ওর নজর। নন্দার দিকেও ওর সদা সতর্ক দৃষ্টির অভাব নেই!

কিরীটি ওষ্ঠ ধৃত নিভে যাওয়া সিগারটায় পুনঃ অগ্নি সংযোগে ব্যস্ত ছিল। মৃদু কণ্ঠে বললে: হাঁ তাত দেখতেই

পেলাম। রাজা টিকেন্দ্রজিতের ব্যাপারে মিস্ জোন্স্ একটু বিশেষই মনোযোগী।

শেষের কথাগুলো অন্যের অশ্রুত ভাবে মৃদুচ্চারিত হলেও আমার কাণে প্রবেশ করেছিল। আমি বারেকের জন্য চম্‌কে কিরীটির মুখের দিকে তাকালাম কিন্তু তার পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখের কোন রেখারই কোন পরিবর্তনই আমার চোখে পড়ল।

কথায় কথায় ব্যারিস্টার তেজেশ আবার বলছিলেনঃ বিবাহের পর বছর পাঁচেক নন্দা আর টিকেনকে দেখে মনে হতো পৃথিবীতে টিকেন ও নন্দার মত এমন hppy pair বুঝি হয় না। কি আমুদেই না ওরা ছিল। আর কি হৈ চৈ-ই না করত। কিন্তু সব কিছু যেন একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল হঠাৎ নন্দা অসুস্থ হ'য়ে পড়ায়। ওর মুখের হাসি যেন একেবারে ব্লটিং পেপার দিয়ে চিরদিনের মত কে শুষে নিল। টিকেনের সেসময়কার দিনগুলোর কথা এখনো আমার মনে আছে। How wreched he looked! তারপর ডরোথি এসে একটু একটু করে আবার টিকেনের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে!

'এ তো। মানে রাজা সাহেবের এই পরিবর্তনে আপনার বোন সুনন্দা দেবী নিশ্চয়ই সুখী হয়েছেন খুব—' হঠাৎ কিরীটি প্রশ্নটা করল আচম্‌কা যেন।

'হ্যা! হাঁ—তা—তা হয়েছে বৈকি! আগেত টিকেন সর্বদাই নন্দার কাছে কাছে তার রোগ শয্যার আশে পাশে

থাকতো এখন তবু আবার কিছুদিন থেকে বাইরে একটু আধটু বের হয়!—'

'অসুবিধা না হলে চলুন না একবার রাণী সাহেবার সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি মিঃ ঘোষ!—'

'যাবেন! বেশত। একটু তাহ'লে অপেক্ষা করুন আপনারা। আমি আগে একটা খবর দিয়ে আসি।—'

'তাই যান।'

ব্যারিস্টার তেজেশ চলে গেলেন সংবাদ দিতে।

ঘরের মধ্যে আমি আর কিরিটি দু'জনে মুখোমুখি।

হঠাৎ কিরিটি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেঃ বিক্রম-উর্বশী নাটকটা পড়েছিস সুব্রত! মহাকবি কালিদাসের লেখা?

'হাঁ!—' জবাব দিলাম।

'কিন্তু আমাদের রাণী সাহেবার নিশ্চয়ই পড়া নেই!—'

'না থাকাটাই সম্ভব!—কিন্তু ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে পারছিস?—'

'কিছু কিছু—তবে বিবৃতি দান মূলাকাতের পর—'

তারপর একটু হেসে বললে, 'চলত পুরুরবা মহিষীর সঙ্গে আগে একবার সাক্ষাৎকার করে আসা যাক! তাতে করে উর্বশীর সম্পর্কে মনোভাবটা কি যদি জানা যায়!—'

আমি হেসে ফেলি।

কিরীটি প্রশ্ন করে, 'হাসছিস যে?'

'কিন্তু এ নাটকে দৈত্যরাজটি কে ?' প্রশ্ন করলাম।

'ক্রমশঃ প্রকাশ্য! কিন্তু চুপ ব্যারিস্টার সাহেব বোধ হয়—এই দিকেই আসছেন।'

সত্যিই বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল এই দিকেই আসছেন

—গ—

কিরীটির কথাই ঠিক।

ব্যারিস্টার তেজেশ এসে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন : চলুন মিঃ রায়!

বিরাট প্রাসাদ। দীর্ঘ টানা দুটি বারান্দা অতিক্রম করে আমরা ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে রাণী সুনন্দার কক্ষের দ্বারে এসে পৌঁছালাম। ভারী দামী ডিপ সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে দ্বারে।

পর্দা তুলে তেজেশ সর্বাগ্রে কক্ষে প্রবেশ করলেন পশ্চাতে আমরা প্রবেশ করলাম।

বেশ প্রশস্ত কক্ষ। দেওয়াল ডিসটেম্পার করা : ফিকে সবুজ রং। কক্ষের মধ্যে আসবাবপত্রের বিশেষ কোন বাহুল্য না থাকলেও সম্পদ, রুচি ও আভিজাত্যের একটা অতীব পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। একটি ডবল খাটের উপরে পরিচ্ছন্ন শ্বেতশুভ্র শয্যায় উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে আধাশোয়া ও আধাবসা অবস্থায় রয়েছেন রাণী সুনন্দা।

কোমর পর্যন্ত দামী মেরুণ রঙের পশমের একটা সূচী কাজ করা চাদরে ঢাকা। খাটের পাশেই পাশাপাশি দুটি শ্বেতপাথরের টেবিল। একটি টেবিলের 'পরে সুদৃশ্য একটি টাইম পিস্ ও সবুজ

ঘেরাটোপ দেওয়া টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। তারই নীচে একটি ফটো-স্ট্যাণ্ডে বাঁধান দু'টি সুকুমার কিশোরের ফটো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

অন্য টেবিলটির 'পরে খানকয়েক ইংরাজী বাংলা বই। ছোট একটি সুদৃশ্য দামী রেডিও সেট্ ও কয়েকটি ঔষধের শিশি। ঘরের দেওয়াল সম্পূর্ণ নিরাভরণ। একটি ক্যালেণ্ডার বা একটি ছবি পর্যন্ত নেই।

ঘরের মেঝেটি সুন্দর। চক্‌চকে মসৃণ শাদা মার্বেল পাথরে তৈরী।

টেবিল ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলোয় ঘরের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে।

ঘরে ঢুকতেই একটা মৃদু কস্তুরীর সৌরভ নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করেছিল। কোথা হ'তে আসছে মিষ্টি গন্ধটি। এদিক ওদিক তাকাতে উপরের দিকে নজর পড়ল—সিলিং হ'তে ঝুলন্ত সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত একটি রৌপ্য নির্মিত ধূপাধার।

কস্তুরী ধূপের গন্ধ সেখান হতেই ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিন চারটি জানালা ঘরের—খোলা যদিও প্রত্যেকটি। তবে সূক্ষ্ম নেটের পর্দা খাটানো প্রতি জানালায়।

আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে রাণী সুনন্দাই হাত দুটি তু'লে নমস্কার জানালেন ক্লান্ত মৃদু কণ্ঠে: আসুন।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় একজন ভৃত্য তিনটি চেয়ার এনে রাণীর শয্যার পাশে রেখে চলে গেল।

রাণী আবার বললেন, 'বসুন—'

তিনটি চেয়ার অধিকার করে আমরা তিন জনে বসলাম।

রাণী সুনন্দার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম।

জীবনে বহু সুন্দরী রমণী চোখে পড়েছে। কিন্তু এমনটি যেন আর পূর্বে দেখিনি। শুধু সুন্দর নয় আশ্চর্য। অ-পূর্ব!

কোমর হ'তে দেহের ঊর্ধ্বাংশ যতটুকু নিরাবরণ, চাদরে আবৃত নয় এবং চোখে পড়ছিল সে অংশের সমস্তটুকু অপূর্ব নিখুঁত।

গায়ের রং হয়ত এককালে খুবই ফর্সা ছিল, দীর্ঘ দিন শয্যাশায়িনী থেকে ও রোগে ভুগে ভুগে একটু ফ্যাকাসে ও রক্ত শূন্য মনে হয়।

লম্বাটে ধরনের মুখখানি। সুচারু কপাল। সুচারু যুগ্মভ্রূ। যেমন সুন্দর নাক তেমনি সুন্দর চক্ষু দু'টি ও পাতলা ফুলের পাপড়ির মত ওষ্ঠ। চূর্ণ কয়েকগাছি কুন্তল স্থান ভ্রষ্ট হ'য়ে কপোল ও কপালের পরে লতিয়ে আছে যেন। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় একটা গভীর ক্লান্তি ও যাতনার চিহ্ন যেন মুখের রেখায় রেখায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। শ্লথ দুটি হাত বুকের কাছে পরস্পারের সঙ্গে আবদ্ধ। চারু মণিবন্ধে দু'গাছি করে মাত্র সোনার চুড়ি। গলায় সরু একটি বিছে হার মাত্র। এবং কানে দুটি নীলা পাথর আলোয় যেন সাপের চোখের মত চিকচিক করছে। শরীরের আর কোথাও অলঙ্কারের কোন বাহুল্য মাত্র নেই।

'নন্দা—পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ কিরীটি রায় ও ওরই বন্ধু সুব্রত রায়।—'

আমরা পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার জানালাম।

ভাবছিলাম কিরীটি কিভাবে তার কথারম্ভ করবে।

কিন্তু কিরীটিকে কথা আরম্ভ করতে হলো না শুরু করলেন ব্যারিস্টার সাহেবই।

'যা হবার তাত হয়েই গিয়েছে নন্দা ভেবে আর কি হবে! কিন্তু যে এতবড় সর্বনাশ আমাদের করে গেল তাকে যদি শাস্তি না দিইত রুণু বেণুর আত্মা শান্তি পাবে না!—'

রাণী সুনন্দা চুপ করে রইলেন। ভাইয়ের কথায় কোন জবাব দিলেন না।

'দেখুন রাণী সাহেবা, এ ব্যাপারে হাত দেবার আগে আপনার মতামতটাই সর্বাগ্রে আমার প্রয়োজন। অবশ্যই জানবেন আপনার মত না থাকলে আমি কালই ফিরে যাবো।—'

কিরীটির কথায় চকিতে মুখ তুলে রাণী সুনন্দা ওর মুখের দিকে তাকালেন।

'পারবেন আপনি মিঃ রায়?—' প্রশ্ন করলেন রাণী সাহেবা যেন হঠাৎই।

'পারবো আশা করি।—'

'তবে চেষ্টা করুন।—'

'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি রাণী সাহেবা। তথাপি কয়েকটা প্রশ্ন না করে আমি পারছি না।—'

এবারে কিরীটি হঠাৎ ব্যারিস্টার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে: মিঃ ঘোষ, যদি মনে কিছু না করেন ত' আমার ইচ্ছা রাণী সাহেবাকে আলাদা ভাবে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

'ও নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই—আমি বাইরেই আছি নন্দা।'

ব্যারিস্টার তেজশ কক্ষ হ'তে নিস্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন।

'সুনন্দা দেবী, সত্যি করে বলুনত আমায়, এখানে কেউ নেই—আপনার প্রিয়তম পুত্রদের হত্যার ব্যাপারে আপনি কাউকে কি সন্দেহ করেন?—'

কিরীটির প্রশ্নে আচমকা রাণী সুনন্দা কিরীটির মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তার শান্ত বিষণ্ণ চোখদুটি যেন সহসা ধারালো ছুরির ফলার মত ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। সমগ্র মুখখানার মধ্যে একটা রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। স্থির অপলক দৃষ্টিতে রাণী কিছুক্ষণ কিরীটির চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'বলুন! কারো উপরে যদি এতটুকুও আপনার সন্দেহ থাকে। যদিও এখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই তবু জানবেন আমি আপনি ও সুব্রত ছাড়া একথা জগতে আর কেউ জানতে পারবে না। এমন কি কথা দিচ্ছি আপনার স্বামী রাজা টিকেন্দ্রজিৎও জানতে পারবেন না যদি আপনি ইচ্ছা করেন।—'

কিন্তু রাণী সুনন্দা নির্বাক। স্তব্ধ। স্থির নিশ্চল যেন একটি পাষাণ মূর্তি! দেখতে দেখতে রাণী সুনন্দার প্রখর ধারালো

ছুরির ফলার মত দৃষ্টি ক্রমে যেন ঝিমিয়ে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে এলো। মুখের রক্তোচ্ছ্বাস নিভে গেল। আবার সেই রুগ্ন ফ্যাকাসে ক্লান্ত মুখ।

ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বললেন: কাকে আর সন্দেহ করবে মিঃ রায়। সবই আমার দুর্ভাগ্যের দোষ। নইলে এমন অঘটনই বা ঘটবে কেন! রুণু বেণুকে এমন করেই বা আমাকে হারাতে হবে কেন?

বলতে বলতে রাণী সুনন্দার কণ্ঠস্বর কান্নায় জড়িয়ে এলো! চোখের কোল বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু নেমে এলো।

'আচ্ছা আপনার স্বামী নিশ্চয় আপনাকে খুব ভালবাসেন না? অন্তত সেই রকমই শুনেছি।—' এক সময় আবার কিরীটি প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ। বোধ হয় ভালবাসেন।—'

'বোধ হয় কেন বলছেন?—'

'সত্যিই এ অভাগীর প্রতি তার যথেষ্ট দয়া।—'

কিরীটির ত নয়ই, আমারও বুঝতে কষ্ট হয় না সম্মুখে অর্ধশয়নের ভঙ্গীতে উপবিষ্ট পঙ্গু নারীর বুকে কোথায় ব্যথা।

'আচ্ছা একটা কথা। আপনার ইচ্ছাক্রমেই ত আপনার ছেলেদের সর্বদা দেখাশুনা ও যত্ন নেবার জন্য মিস ডরোথি জোন্সকে এখানে আনা হয়েছিল!—'

'হাঁ!—তাই বোধহয় ওই ডাইনীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসেই

রুণু বেণু আমার অকালে ঝরে গেল—বলবেন না। বলবেন না আর ওর কথা!—' রাণী সুনন্দা যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'ডরোথি জোন্সকে আপনার পছন্দ নয় বুঝতে পারছি।—'

'জানেন মিঃ রায়। ও যাদু জানে। আমার স্বামীকে ও যাদু করেছে। ছেলে দুটোকেও আমার যাদু করেছিল। যে রুণু বেণু দিনে দশবার করে আগে আমার ঘরে ছুটে ছুটে আসত গত এক বৎসর ধরে ওরা এ ঘরের ছায়াও মাড়াত না!—'

'সে হয়ত অসুস্থ আপনি, বিরক্ত হবেন তাই আপনার কাছে ঘন ঘন তারা আসতো না!—'

'না, না আমি ঠিক জানি—ঐ ডাইনীই বারণ করে দিয়েছিল নিশ্চয়ই!—'

'মিস ডরোথিকে আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করেন নি কেন?—'

'জিজ্ঞাসা করবো কি! ও শয়তানীকে কোন কথা কি বলা যায়! ওই ডাইনী—' রাণী সুনন্দার কথা শেষ হলো না আচমকা ঘরের মধ্যে হাতে একটা গ্লাস নিয়ে প্রবেশ করলো ডরোথি জোন্স।

রাণীর চোখের দৃষ্টি খোলা দরজার বরাবর ছিল। ডরোথিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই রাণী যেন হঠাৎ বদলে গেলেন। তার মুখের চেহারা মায় তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত। অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে বললেন: ডরোথি এসো।

'তোমার হরলিক্স খাবার সময় হয়েছে রাণী!'

পরস্পরের মধ্যে ইংরাজীতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। দেখলাম রাণী চমৎকার ইংরাজী বলতে পারেন।

'না। হরলিক্স এখন আমি খেতে পারবো না!—'

'তাই কি হয়। শরীর তাহ'লে টিকবে কি করে!—'

'না! না—'

'খেয়ে নাও দেখি লক্ষ্মী মেয়ের মত। ছিঃ দুষ্টুমি করে না!—'

রাণী এবারে হাত বাড়িয়ে ডরোথির কাছ হ'তে গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে হরলিক্সটা সব খেয়ে নিলেন।

ডরোথি সযত্নে ন্যাপকিন দিয়ে রাণীর মুখ মুছিয়ে যেমন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই আবার নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল, আমরা যে দুটি প্রাণী ঘরের মধ্যে আছি সে দিকে তাকাবার বা দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন মাত্রও যেন বোধ করলে না।

আশ্চর্য! ডরোথির কক্ষ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাণীর চোখে মুখে আবার সেই বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা যেন রুক্ষ ভাবে ফুটে উঠলো। অথচ ঐ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব মুহূর্তে যেন ডুবে গিয়েছিল ডরোথির এই কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কেন?

ডরোথির কক্ষ ত্যাগের পরও কিছুক্ষণ কারো মুখেই কোন কথা থাকে না। কক্ষের মধ্যে একটা বিশ্রী স্তব্ধতা যেন আমাদের ঘিরে ধরেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল রাণীর কণ্ঠস্বরে।

দেখলেনত মিঃ রায়। গায়ে পড়ে কি ভাবে স্নেহ জানাতে আসে।—দু'চক্ষের বিষ আমার।—'

কিরীটি মৃদু হেসে বললেঃ পছন্দ যখন করেন না মিস্ জোন্সকে বরখাস্ত করলেইত পারেন। আর তাছাড়া যে জন্য ওকে এখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল তারওত আর কোন প্রয়োজন নেই।

'বরখাস্ত! হু! এ হয়েছে আমার যেন সাপের ছুঁচো গেলা। গিলতেও পারছি না উগরাতেও পারছি না।'

'কেন বলুনত ?—'
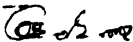
'আর কেন! বলতে লজ্জায় আমার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার অমন দেবতার মত স্বামী! ডাইনীর খপ্পরে পড়ে একেবারে সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে।—'

'আপনার কথা কি তিনি আর আজকাল শোনেন না ?—'

'না, না—তা কেন, শোনেন বৈকি !—'

'তবে ?—'

'কেমন করে একথা তার কাছে বলবো বলতে পারেন। আমিওত মেয়েমানুষ! পাঁচ বছর ধরে এই ভাবে পঙ্গু হ'য়ে বিছানায় পড়ে আছি। চোখের উপরেইত দেখেছি কি ভাবে দিনের পর দিন লোকটা তার জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ বাদ দিয়ে আমার শয্যার পাশে পাশে থেকেছে। সদা সতর্ক দৃষ্টি কেমন করে আমায় সুখে রাখবে। কেমন করে আমাকে প্রফুল্ল রাখবে। অমন আমুদে হাসি-খুশি লোকটা আমার পাশে পাশে

সর্বদা থেকে হাসতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। স্ত্রী হ'য়ে কেমন করে তা সহ্য করি বলুন? মিস্ জোন্স এখানে আসবার পর থেকে আবার ওর মুখে হাসি ফুটেছে। তাই! তাই মিঃ রায় সব বুঝেও কিছু বলতে আমি পারি না। স্বার্থপরতার এত বড় আঘাত হানতে আমি পারি না! এযে কি যন্ত্রণা আমার বুঝবেন না। পুরুষ আপনারা বুঝবেন না! বুক ভেঙ্গে যায়। তবু, তবু—মুখ বুজে থাকি—' কান্নায় রাণী সুনন্দা একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়েন।

নির্বাক আমরা দু'জনে বসে থাকি। কিইবা বলতে পারি। আর বলবার কিইবা আছে।

এইটুকুই শুধু বুঝতে পারি কি মর্মান্তিক যাতনায় সম্মুখে উপবিষ্টা এই নারীর বুকের ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে নিশিদিন।

অঞ্চলে চোখের জল মুছে রাণী আবার বলতে লাগলেন: অথচ একথা স্বীকার না করলেও পাপের অবধি থাকবে না যে, ও কি স্নেহে কি যত্নে সর্বক্ষণ আমার রুগ্ন বেণুকে ঘিরে রাখত। পঙ্গু অসুস্থ মায়ের অভাব কি ভাবে ওদের মিটিয়েছে ও।

'আচ্ছা সুনন্দা দেবী। আপনি কি কখনও ক্ষমা করবেন, কথাটার জন্য, মিস জোন্সের প্রতি আপনার স্বামীর কোন বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন?—'

'না! সত্যিই বলবো কোন দিন কারো সম্পর্কে কিছু কারো

কাছ হতে শুনিওনি দেখিওনি। কিন্তু তাহলে কি হবে! আমার স্বামীর মুখের প্রত্যেকটি রেখার সঙ্গে যে আমি পরিচিত। মুখে কিছু না বললেও কোন দিন এবং কোন দিন হাবে ভাবে কিছু প্রকাশ না পেলেও ঐ মুখের দিকে তাকালেই যে আমি সব কিছু টের পাই-

'সেত আপনার মনের ভুলও হ'তে পারে ?—'

'ভুল! আপনি পুরুষ মানুষ মিঃ রায়। অন্যথায় নারী হলে বুঝতেন, যেখানে সত্যিকারের ভালবাসা আছে সেখানে নারী বিশেষ করে স্ত্রী তার স্বামীর মুখের দিকে তাকালেই সব কিছু বুঝতে পারে। গোপন কিছুই সেখানে থাকে না। আয়নার মতই সব কিছু সেখানে পরিষ্কার হ'য়ে প্রতিবিম্বিত হয়। ফাঁকি সেখানে চলে না।'

এবারে কিরীটি সোজাসুজিই একেবারে প্রশ্ন করল ঃ

আপনি কি তা'হলে আপনার সন্তানদের মৃত্যুর ব্যাপারে মিস্ জোন্স্‌কে সন্দেহ করেন রাণী সাহেবা ?—

একটা আর্ত চিৎকারে রাণী প্রতিবাদ জানালেন ঃ না, না— মেয়ে মানুষ হ'য়ে সে এ কাজ করতে পারে না!

'এইটাই কি আপনার মনের সত্য কথা বলে জানবো সুনন্দা দেবী ?—' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কিরীটির।

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই—হাজার হোক গত চার বছর ধরে সন্তানের মতই ত ডরোথি রুণু ও বেণুকে পালন করেছে। না, না—তা কি করে হবে। তা হ'তে পারে না। তা হ'তে পারে

না। না, না—' শেষের দিকে মনে হলো রাণী সুনন্দ কতকটা নিজেকেই নিজে স্তোক দিচ্ছেন।

'আচ্ছা। এবারে তাহ'লে আমরা উঠি রাণী সাহেবা—'

অতঃপর নমস্কার জানিয়ে আমরা কক্ষ হ'তে বের হয়ে এলাম।

বাইরের বারান্দায় পা দিতেই দেখি ব্যারিস্টার সাহেব বারান্দায় একটা বেতের হেলান দেওয়া চেয়ারে বসে ধূমপান করছেন নিঃশব্দে একাকী।

আমাদের ফিরতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'নন্দার সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তা হলো মিঃ রায়?—'

'হাঁ। চলুন—আমাদের নীচে পোঁছে দেবেন!—'

'চলুন। এদিকে আবার থানা থেকে সংবাদ পেয়ে আপনার বন্ধু দীননাথ ঝা এসে অপেক্ষা করছেন—'

'দীননাথ এসেছে। চলুন—চলুন!—'

চেহারায় আদব-কায়দায় ও কথায় বার্তায় শ্রীযুক্ত দীননাথ ঝা একেবারে পুরোপুরি একজন আদি ও অকৃত্রিম পুলিশ অফিসার।—

মোটা সোটা ভারিক্কী প্যাটার্ণের মেদবহুল চেহারা। এবং ওষ্ঠোপরি একজোড়া পাকানো পুরুষ্টু গোঁফই নয়, কানে রোম প্রাচুর্য দেখেই বোঝা যায় দেহেও রোমের অভাব নেই।

ছোট ছোট ক্ষুদে গোল গোল চক্ষু। অত্যধিক ধূমপানের

পুরু ওষ্ঠ যুগল কালীবর্ণ ধারণ করেছে এবং তার মধ্যে মধ্যে লিউ-কোডারমার সাদা দাগ। নাকটা একটু ভোঁতা।

দৃঢ়বদ্ধ চৌক চোয়াল।

আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই সোল্লাসে আহ্বান জানালেন দীননাথ ঝা ঃ কিরীটি যে কেমন আছিস ?

'ভাল। তারপর তোর কি সংবাদ বল ?—'

'এই কেটে যাচ্ছে একরকম। শালার পুলিশের চাকরির মুখে ঝ্যাঁটা মার—তা এঁকে ত চিনতে পারছি না !—'

'আমার বন্ধু সুব্রত !—'

'নমস্কার সুব্রতবাবু—মনে কিছু করবেন না যেন আমার কথা বার্তা শুনে।—'

হাসতে হাসতে জবাব দিলাম ঃ না, কি আর মনে করবো !

কিরীটির স্কুল জীবনের সবটাই ও কলেজে বি, এস সি পর্যন্ত দীননাথ সহধ্যায়ী ছিল।

বি, এস্ সি পাশ করে মামার জোরে পুলিশ লাইনে ঢুকে পড়ে দীননাথ।

যাহোক প্রাথমিক আলাপাদি সমাপ্ত হবার পর দীননাথ কিরীটিকে বললেন ঃ যাক্ এবারে আসল কথায় আসা যাক। এদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো ?

'প্রাথমিকটা হয়েছে। মোটামুটি ব্যাপারটা জানলাম। এখন তোর মুখ থেকে শুনতে চাই !—' কিরীটি বললে।

'There is nothing much to add ! আগাগোড়া

ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড রহস্য। জার্নিস ত আমার কিন খুঁতখুঁতে মন। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সব দেখেছি। সব খোঁজ নিয়েছি। যদিও বুঝতে পারছি একেবারে পরিষ্কার ভাবে এটা একটা deliberate murder case তবু যেন কোন কারুকে ধরতে ছুঁতে পারছি না। বাড়ির প্রত্যেকেরই alibi আছে। জব্বর মার্ডার কেস বাবা! কি ভাবে যে poison করল ব্যাপারটা যেন সমস্ত বুদ্ধির অগোচর! আর বিষও জোগাড় করেছে বটে মোক্ষম। একেবারে নাইট্রোবেনজিন। পেলেই বা কোথায়, কি ভাবেই বা শরীরে প্রবেশ করালে আগাগোড়া সবটাই যেন একটা মিস্ট্রি!—'

'স্টম্যাক কনটেনটের এ্যানালিসিস করা হয়েছিল?—' কিরীটি প্রশ্ন করে।

'হুঁ! সেখানেও ঢু ঢু। রোগের দু'দিন যখন বাড়াবাড়ি তখন ত স্রেফ লিকুইড ডায়েটেই ছিল, so nothing abnormal detected in the stomach content. কেবল রক্তে ও টিস্যুতে নাইট্রোবেনজিন absorbtion-এর signs পাওয়া যেতেই না বোঝা গেল it's a case of nitrobenzene poisoning.—'

'শরীরে কোন ক্ষত চিহ্ন বা স্কার বা এব্রেসন ছিল?—'

'কিছু না। কিছু না। তবে আর বলছি কি বাবা!—স্রেফ একেবারে গোলক ধাঁধায় ফেলেছে। এই দেখনা মৃতদেহের আটটা দশটা ফটোগ্রাফ পর্যন্ত রেখে দিয়েছি!—see!—'

পকেট হ'তে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিলেন কিরীটির দিকে দীনু ... কথা বলতে বলতে আগ্রহ সহকারে।

খামটা হাতে নিয়ে খামের ভিতর হ'তে কিরীটি টেনে বের করলে আট দশটা post card size-এর ফটো। একেবারে সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহের নানা ভঙ্গীর ফটো মৃত কুমারদের।

'কে তুলেছে রে এই ফটো দীনু!—' কিরীটি ফটোগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে দেখতেই প্রশ্ন করে এক সময়।

'কে আবার এই শর্মা।—'

একটার পর একটা ফটোগুলো হাতে নিয়ে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে কিরীটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে, তারপরই ওর মধ্যে একটা ফটো আরো মনোযোগ সহকারে চোখের সামনে তুলে ধরে দেখতে দেখতে বলে : হুঁ, ফটো তুলতে তুই শিখেছিস দেখছি—পায়ের পাতার মার্জিনে চওড়া ওটা কিসের দাগ পড়েছে রে দীনু ?—যদিও দাগটা খুব faint মনে হচ্ছে just like a light shade.

'কই দেখি—' এগিয়ে আসেন দীননাথ।

'এই দেখ—' কিরীটি ফটোটা এগিয়ে ধরে দীননাথের সামনে নির্দিষ্ট জায়গাটায় আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

'হুঁ। মনে পড়েছে। পায়ে আলতা পড়বার মত দুই কুমারেরই পায়ের পাতার মার্জিনে ও আঙুলের উপরে একটা ব্রাউন রঙের দাগ ছিল। গায়ের রং খুব ফর্সা থাকায় খুব আবছা

ছিল যদিও—আমার ক্যামেরার লেন্সটা খুব powerful থাকায় সেটাও দেখছি উঠেছে!—'

'হুঁ। পায়ের পাতার মার্জিনে ও আঙ্গুলের উপরে ব্রাউন রঙের একটা ছোপ!—' কতকটা আত্মগত ভাবেই কথাটা বলে যেন কিরীটি আপন মনের চিন্তার মধ্যে ডুব দেয়।

'এই ফটোগুলো আপাততঃ আমার কাছে থাক। আপত্তি আছে নাকি তোর!—'

'আপত্তি! বিন্দুমাত্র নয়। তোর জন্যেই ত ফটোগুলো তুলে রেখেছি।'

'খুব বিবেচনার কাজ করেছিস দীনু!—এখন বল তোর জবানীতে কেসটা সম্পর্কে in details!—'

—ঘ—

'তোকে ত আগেই বলেছি কিরীটি!' বলতে সুরু করেন দীননাথ ঝাঃ কুমারদের মৃত্যুর ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি মিস্টিরিয়াস্। মাত্র দিন দুই তিন ভুগে ছেলে দু'টো gradually একটু একটু করে sink করে যেন মারা গেল। রোগী দেখে এখানকার ডাক্তার ও গৌহাটির সিভিল সার্জেন ত ধরতেই পারলে না কি কারণে ঐ ধরনের sign symtoms হচ্ছে। এদিকে কলকাতা হ'তে ডাক্তার সান্ন্যাল এসে পৌঁছবার পূর্বেই সব শেষ হ'য়ে গেল। এবং ডাঃ সান্ন্যালই মৃতদেহ দেখে first suspected some foul play. পড়লো আমার ডাক। আমি এখানে এসে প্রথমেই এখানকার সব লোকগুলোর একটা survey করে ফেললাম। হত্যাকারীর list-এ তাদের মধ্যে কারা কারা পড়তে পারে। ১নং মিস্ ডরোথি জোন্স্! ২নং কুমারদের পুরাতন ভৃত্য মাণিকলাল, নাম্বার থ্রি—ওদের দাই মা নলিনী! —যদিও ফার ফেচেড—নাম্বার ফোর—ওদের গার্জেন টিউটার ধরণীধর। রাজা ও রাণী out of question! তারপরই ভাবলাম হত্যা যে করবে তার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু motive অর্থাৎ উদ্দেশ্য থাকবে। অতএব এক্ষেত্রে কার কি motive থাকতে পারে। Next step এ এলাম—

জবানবন্দী! Now read this file—এর মধ্যেই সকলের জবানবন্দী পাবি।—বলতে বলতে সামনের টেবিলের উপরে লাল ফিতে বাঁধা একটা ফাইল তুলে কিরীটির দিকে এগিয়ে দিলেন দীননাথ ঝা!

জবানবন্দী দেখা গেল প্রত্যেকেরই নেওয়া হয়েছে: বাড়ির কেউ বাদ যায়নি।

রাজা টিকেন্দ্রজিতের জবানবন্দী। উল্টে গেল কিরীটি একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে। বিশেষ কিছু গ্রহণযোগ্য তার মধ্যে নেই।

তারপরই রাণী সুনন্দা দেবীর জবানবন্দী। আমরা ঐ সন্ধ্যায় যতটুকু জেনেছি তার চাইতেও সংক্ষিপ্ত ও বিশেষত্বহীন। ব্যারিস্টার তেজশচন্দ্রর বক্তব্য। কোন গুরুত্বই দেননি দীননাথ ঝা কারণ দুর্ঘটনার সময় তেজেশচন্দ্র অকুস্থান হতে বহু মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন এবং তার এখানে পৌঁছাবার পূর্বেই কুমারদের মৃত্যু ঘটেছে।

এরপরই জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে দাই-মা নলিনীর।

বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। এবং কুমারদের জন্মের সময় থেকেই প্রায় রাজবাড়িতে অবস্থান করছে।

নলিনী এ দেশীয় মেয়ে নয়। পাহাড়ী মেয়ে। দার্জিলিঙ-এর দিকে তার বাড়ি। তার মা আসামের একটি স্টেটে কামিনের কাজ করত। এবং সেখানেই কাজ করতে করতে চা বাগানের ছোট সাহেবের নজরে পড়ে যায়। এবং তারই ফলে হয় নলিনীর জন্ম। এই হলো নলিনীর জন্ম পরিচয়।

মহানন্দ রসিক পুরুষ। পুলিশের কাজে দীর্ঘকাল কাটলেও একদা প্রথম যৌবনে যে, রসাধিক্যে কাব্যচর্চা করতেন তারই ক্ষীয়মান একটা ধারা এখনো যে নিঃশব্দ ফল্গুর মত অন্তরে তার বহে চলেছে, জবানবন্দীর ছলে নলিনীর চেহারার বর্ণনার মধ্যেই সেটা বেশ যেন স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে।

নলিনীর দেহে নর্ডিক ও ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণের ফলে রং ও চেহারার দিক দিয়ে একটা চমৎকার সামঞ্জস্য যেন থেকে গিয়েছে।

মায়ের হলদেটে পাহাড়ী রং ও ইউরোপীয়ান পিতার দেহ সৌষ্ঠব সে পেয়েছে একত্রে।

তবে মুখের গঠনে একটা পাহাড়ী অনার্য ছাপ থেকে গিয়েছে। চৌকো মুখ, ঈষৎ চ্যাপটা নাক ও ক্ষুদে ক্ষুদে গোলাকার চক্ষু। দীঘল লম্বাটে প্যাটার্ণের চেহারা। নলিনীর মায়ের অর্থাভাব ছিল না চা বাগানের ছোটসাহেবের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের দৌলতে। এবং সাহেবের সহচর্যেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক নলিনীকে তার মা সাত বছর বয়স থেকে কনভেণ্টে রেখে দিয়েছিল তার পনের বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু নলিনীকে প্রশ্ন করেও শেষ পর্যন্ত জানা যায়নি কি কারণে কনভেণ্ট ছেড়ে সে চলে আসে। মাঝখানে বছর পাঁচেকের ইতিহাস ধোঁয়াটে। রুণু ও বেণু জন্মাবার মাস সাতেক আগে ওয়ালটিয়রের এক

হোটেলেই রাণী সুনন্দার সঙ্গে নলিনীর প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। হোটেলের ডাইনিংরুমের ইনচার্জে ছিল ঐ সময় নলিনী।

গর্ভাবস্থায় দেখাশুনা করবার জন্য ও সন্তান হলে তাদের সর্বক্ষণ দেখাশুনা করবার জন্য সুনন্দা একজন স্ত্রীলোক খুঁজছিলেন।

ঐ সময় হোটলে নলিনীকে দেখে সুনন্দার ভারী পছন্দ হ'য়ে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত নলিনী হোটেলের কাজে ইস্তফা দিয়ে যে, কারণেই হোক রাণী সুনন্দারা যখন মাস দেড়েক বাদে ফিরে আসেন দেশে ওয়ালটিয়ারের হোটেল থেকে তাদের সঙ্গে চলে আসে। এবং সেই সময় হতেই নলিনী রাজপ্রসাদে আছে। নলিনীর পুর্ব ইতিহাস এইটুকুই। রুণু রেণুর জন্মের পর হ'তে নলিনী তাদের সর্বদা দেখাশুনার ভার নেয়। নলিনীকে প্রাসাদের লোকেরা সেই হ'তে কুমারদের দাইমা বা দাই বলেই জেনে এসেছে। নলিনার বেশভূষার বিশেষ কোন বাহুল্যই নেই। সরু পাড় শাদা ধুতি ও ব্লাউজ। হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি। কিন্তু এই সামান্য বেশভূষাতেই তার চেহারার মধ্যে এমন একটা রুচি ও পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠে যে, সহজেই মনে হয় যেন সে অন্যান্য দশজন থেকে পৃথক হ'য়ে গিয়েছে। এবং তার সম্যক পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত সে যে রাজপরিবারের একজন নয় বোঝাও সহজ নয়। তার চালচলন কথাবার্তার মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে অন্য দশজনার থেকে।

গভর্নেস ডরোথি জোন্স আসবার পর থেকে যদিও নলিনীর

কাজ একটু কমেছিল তদসত্বেও সেই বেশীর ভাগ সময় কুমারদের ঘনিষ্ঠ সহচর্যে থাকত। এবং তার থাকবার ঘরও প্রাসাদের ঠিক কুমারদের শয়ন কক্ষের পাশের ছোট একটি ঘরেই ছিল। গভর্ণেস্ জোন্স এখানে আসবার পর হতে নলিনীর কাজকর্মের মধ্যে ছিল ওদের জামা কাপড় জুতো মোজা ও আহারাদির ব্যাপারটার' পরে নজর রাখা। বাকী তত্বাবধানের ভার পড়েছিল কুমারদের মিস জোন্সের উপরেই।

নলিনীর জবানবন্দীতে জানা যায়ঃ মৃত্যুর আগে গত এক সপ্তাহ ধরেই কুমারদের শরীরটা যেন তেমন সুবিধার যাচ্ছিল না। কুমারদের স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলাধূলার ইত্যাদির দায়িত্ব ছিল মিস জোন্সের পরেই, তাই নলিনী মিস জোন্সেরই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু জোন্স নাকি জবাব দিয়েছিল: নলিনীকে সে জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। এবং মৃত্যুর চার দিন আগে সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গাতে গিয়ে নলিনী কুমারদের বিশেষ রকম অসুস্থ দেখেই জোন্সকে সংবাদ দেয়। তারপরই ডাক্তার আসে। পরের দিন রাজা শিকার থেকে ফিরে আসেন বেলা দশটা নাগাদ। মৃত্যুর দিন চারপাঁচ আগে হতেই কুমারদের আহারের প্রতি তেমন রুচি ছিলনা।

মিস্ ডরোথি জোন্সের জবানবন্দী হ'তে জানা যায়। নলিনীর আগেই নাকি তার কুমারদের স্বাস্থ্যের পরে নজর পড়ে। এবং তিনি স্টেটের ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। ডাক্তার বংশীধর এসে কুমারদের পরীক্ষা করে রেস্ট নেবার কথাই

বলে যান। পরে মৃত্যুর তিন দিন আগে যখন কুমারদের সকালের দিক থেকেই শরীর ক্রমে নীল হ'য়ে আসতে থাকে; বমি বমি ভাব ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হ'তে/ সুরু করে তখন নিজে পরীক্ষা করে বিশেষ কিছু না বুঝতে পারায় গৌহাটির সিভিল সার্জেনকে সংবাদ দেন। কিন্তু সিভিল সার্জেনও এসে বিশেষ কোন সুবিধা করতে 'পারে না। অসুস্থ হবার আগের দিনও বৈকাল পর্যন্ত তারা মোটামুটি সুস্থই ছিল। বিকালে রুটিন মাফিক নিয়মিত বেড়াতে বের হয়, রাত্রে অবশ্য পড়াশুনা করে না। সামান্য কিছু খেয়েই বিছানায় শুতে যায়।

দীননাথ ঐ সময় প্রশ্ন করেন, 'পড়াশুনা করেনি কেন ?—'

'ডাঃ বংশীধর দাশ বলেছিলেন rest নিতে !—'

'রাত্রে কুমাররা কি খেয়েছিল জানেন কিছু ?—'

'না, কারণ কুমারদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা নলিনীই দেখা শোনা করত সর্বদা।'

—৬—

ভৃত্য মাণিকলালের জবানবন্দী।

বিশেষ কোন সংবাদ তার কাছ থেকেও পাওয়া যায়নি।

অসুস্থ হবার পর হ'তে যদিও মাণিকলাল ঘরের আশেপাশেই ছিল—তাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। অসুস্থ হবার আগের দিন বৈকালে নিত্যকারের মত মাস্টারবাবুকে নিয়ে কুমারদের সঙ্গে গাড়িতে করে বেড়াতে গিয়েছিল সে।

'সে সময় কুমারদের শরীরের অবস্থা কেমন ছিল?—'

'খুব ভাল বলে মনে হয়নি। কেমন যেন চুপ চাপ ছিল।—'

মাস্টার ধরণীধর।

কুমাররা অসুস্থ হবার দিন পাঁচেক আগে হতেই তাদের পড়াশুনা বন্ধ ছিল মিস জোন্সের নির্দেশ ক্রমে।

অর্থাৎ কারোর জবানবন্দীতেই বিশেষ কিছু জানা যায় না। এবং রহস্য যেখানে ঘনিয়ে উঠেছে সেখানে কোন আলোক সম্পাতই হয়নি। ধোঁয়াটে অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে।

জবানবন্দীর ফাইলটা পড়া শেষ কার কিরীটি অন্যমনস্কভাবে যখন ফাইলটা আবার গুছিয়ে বাঁধছে দীননাথ বললেন: মোটিভের কথা যদি বল তবে এক্ষেত্রে কারো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কুমারদের জন্যই এরা প্রত্যেকে চাকরিতে মোটা মাইনায় নিযুক্ত ছিল। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে—কুমারদের মৃত্যুতে এরা কেউই ক্ষতিগ্রস্থ ভিন্ন লাভবান হবে না।

কিরীটি এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, এবারে বললে: তোমার তাহ'লে মত সন্দেহের তালিকাভুক্ত এদের কাউকেই করা চলেনা। কিন্তু বন্ধু, এমনও ত হ'তে পারে কথামালার সেই একচক্ষু হরিণের গল্পের মত সমস্ত ঘটনাটার একটা দিকেই তোমার নজর পড়েছে এবং যেদিকটায় নজর দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করনি মৃত্যুবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে সেই দিক থেকেই।

'কি বলতে চাও কিরীটি?—'

'বলছিলাম অকুস্থানের আশপাশটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছিলে?—'

'কি রকম?—'

'এই ধর যে ঘরে কুমাররা মারা যায়। যে ঘরে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ থাকত। তারপর I mean নলিনীর ঘরটা?—'

'হাঁ! তা করেছি বৈকি! এমন কোন কিছুই সেখানে নজরে আসেনি যা সন্দেহ জাগাতে পারে মনে!—'

'হুঁ! আচ্ছা—এই যাদের সব জবানবন্দী নিয়েছ তাদের কারো কাছ থেকে প্রশ্ন করবার সময় এমন কোন ঘটনার উল্লেখ কিছু শুনেছো যেটার কোন রূপ বিশেষত্ব তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বা তোমার কাছে কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়েছে?—'

'কই এমন কিছু মনেত পড়ছে না!—'

'ভাল করে একটু ভেবে জবাব দাও দীননাথ!—'

'না। মনে পড়ছে না।—'

যাহোক অতঃপর সে রাত্রের মত দীননাথ বিদায় নিলেন। দীননাথের বিদায় নেবার কিছুক্ষণ পরেই আমাদেরও আহারের ডাক পড়লো রাত্রের।

—৮—

আহারাদির পর আমি আর কিরীটি বাগানে বেড়াচ্ছিলাম।

রাজা টিকেন্দ্রজিতের উদ্যানটি সত্যিই দেখবার মত। পূর্ণিমার পরের রাত্রি। আকাশে চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল। আর বাতাসে ছিল ফুলের একটা মিশ্র মিষ্টি সৌরভ।

অনেকক্ষণ ধরে বাগানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এক সময় আমরা দু'জনে একটা পাথরের বেঞ্চের 'পরে উপবেশন করলাম। কতক্ষণ বেঞ্চিটার 'পরে বসেছিলাম মনে নেই। উঠ্‌তে যাবো এমন সময় হঠাৎ কানে এলো কোন পুরুষের একটা চাপা কর্কশ কণ্ঠস্বর।

কিরীটি আমার হাতের 'পরে মৃদু একটা আকর্ষণে করে বসবার ইংগীত করলে। বসে পড়লাম।

'পরশু রাত্রের ট্রেনেই—' কথাটা ইংরাজীতেই উচ্চারিত হলো।

প্রত্যুত্তরে কোন এক নারী কণ্ঠে ইংরাজীতেই যেন কি বললে ঠিক বোঝা গেল না।

আবার পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল : হুঁ! that's absurd!

এবারেও নারী কণ্ঠের জবাবটা শোনা গেল না। অস্পষ্ট ক্ষীণ।

এরপর ক্ষীণ একটা পদশব্দ পাওয়া গেল। বোঝা গেল কেউ হেঁটে চলে গেল।

আমরা কিন্তু বসেই রইলাম।

আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আরো কেটে গেল।

হঠাৎ এমন সময় আবার পদশব্দ। সামনের দিকে তাকাতেই এবারে স্পষ্ট দেখা গেল দীর্ঘকায় এক নারী মূর্তি এই দিকেই আসছে। এবং চাঁদের আলোয় স্পষ্ট এবারে চিনতে এতটুকুও আমাদের কষ্ট হলো না: মিস ডরোথি জোন্স। একটা ঝোপের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধীর পদবিক্ষেপে।

গায়ে একটা শাদা পাত্‌লা শ্লিপিং গাউন।

আমরা যে বেঞ্চির পরে বসেছিলাম তার পাশ দিয়ে অন্দরে যাবার পথ।

নিঃশব্দে মাথা নীচু করে হেঁটে আসছে মিস্ জোন্স বেশ যেন একটু অন্যমনস্ক। আমাদের কাছাকাছি এসে চোখ তুলতেই হঠাৎ মিস্ জোন্স, একেবারে আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল।

'কে ?—' ইংরাজীতেই প্রশ্ন এলো।

তারপরই বোধহয় আমাদের চিনতে পেরে বললে: ও। আপনারা ?

আর দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে মিস্ জোন্স এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কিরীটি বাধা দিয়ে ডাকল: Just a minute please Miss Jonse if you don't mind!

মিস্ জোন্স ফিরে দাঁড়াল।

'যদি কিছু মনে না করেন ত আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা ছিল!—' কিরীটি আবার বললে।

'বলুন ?—'

'বসুন না—'

মিস্ জোন্স বসল বেঞ্চের 'পরে। আমরাও পাশাপাশি বসলাম।

'আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন কেন রাজা সাহেব এখানে আমাদের ডেকে এনেছেন—'

'জানি!—'

বলা বাহুল্য ইংরাজীতেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

'ভেবেছিলাম কাল প্রত্যূষেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবো কিন্তু সুযোগ যখন মিলেই গেল ভাবলাম আলাপটা সেরে নিই। যদিও সময়টা খুব প্রশস্ত নয়—'

'তাতে কি! বলুন কি বলতে চান। রাত বারটার আগে সাধারণত আমার ঘুম আসে না। তাই রাত্রে ঘুমের আগে বাগানে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াই!—' মিস্ জোন্স বললে।

'আচ্ছা রাণী সুনন্দা দেবীকেত অনেকদিন থেকেই আপনি দেখছেন। তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি মিস জোন্স ?'

কিরীটির প্রশ্নে মিস জোন্স মৃদু হাসল: আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি মিঃ রায়। এবং রাণীর সঙ্গে যখন আপনার আলাপ

হয়েছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তিনি আমাকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন না!

ঠিক এই ধরনের জবাবটা যেন আমরা প্রত্যাশা করিনি। তাই এরপর কিরীটির প্রশ্নটা কোন পথে এগুবে বুঝতে পারছিলাম না।

'কেন বলুনত। যদিও সেই রকম আমাদেরও মনে হলো তাঁর কথায় বার্তায়!—' কিরীটি বললে।

'বোধহয়ত জেলাসি!—'

'জেলাসি।—'

'হাঁ! তাছাড়া আর কি বলুন? তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যায় শুয়ে আছেন এ সময় স্ত্রীলোক হলে বুঝতেন, স্ত্রীমনের এটা একটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে কোন স্ত্রীর পক্ষেই তার স্বামীর আশে পাশে কোন স্ত্রীলোককে দেখলে সেই স্ত্রীলোকের পরে হিংসা জন্মানো!—'

'কেবল কি তাই বলেই আপনার মনে হয় মিস জোন্স? আর কি কোন কারণই নেই?—'

'আমারত তাই মনে হয়—'

'হুঁ। আচ্ছা রাজা টিকেন্দ্রজিৎ লোকটিকে আপনার কি রকম মনে হয়?—'

'একেবারে perfect gentleman! অমন শিক্ষিত ভদ্ররুচি সম্পন্ন লোক সাধারণত বড় একটা চোখেই পড়ে না।—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কিরীটি আবার প্রশ্ন করে,

'আচ্ছা কুমারদের মৃত্যুর ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয় ?'

'সকলেই ত বলছে there is some thing wrong!

'আমি আপনার কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম!—'

'ব্যাপারটা যেমন shocking তেমনি দুঃখের আমার পক্ষে— ও সম্পর্কে কোন কিছু আমাকে না জিজ্ঞাসা করলেই বাধিত হবো মিঃ রায়!—'

হঠাৎ এবারে কিরীটি প্রশ্ন করে: আচ্ছা এখান হ'তে কলকাতায় ফিরবার লাস্ট ট্রেনটা রাত্রে ক'টায় ছাড়ে বলতে পারেন ?

কিরীটির প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকাল মিস্ জোন্স তার মুখের দিকে এবং ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ছোট্ট একটি মাত্র শব্দে: না।

'একটু আগে আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন ঐ ঝোপের ধারে ?'

'আমি!—কি বলছেন আপনি ?—'

মিস জোন্সের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়।

'ঠিকই বলছি!—'

'কিন্তু আমি ত কারো সঙ্গেই কথা বলিনি। আপনি— আপনি বোধহয় ভুল, করছেন। If you don't mind!'

'ভুল!—'

'হাঁ!—আমি—আমিত কারো সঙ্গেই কথা বলিনি!—'

'তবে বোধহয় শুনবারই ভুল হয়েছে আমার।—'

অতঃপর কিরীটি যেন কিছুক্ষণ কি ভাবে মনে মনে তারপর হঠাৎ আবার কিরীটি একটু থেমে প্রশ্ন করে।

'আপনি ত কুমারদের গভর্নেস ছিলেন। তারা মারা গিয়েছে এখনো আপনি যাননি কেন?—'

'আশা করি ও প্রশ্নের জবাবে আপনার কোন অধিকার নেই এ কথাটা আপনি ভুলবেন না!— আচ্ছা Good night!' বলে আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে মিস জোন্স স্থান ত্যাগ করল।

পরের দিন প্রত্যূষে। ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গেই আমরা কুমারদের ঘর দেখতে গেলাম।

ধনীর দুলালদের মানুষ হবার জন্য যা যা প্রয়োজন এবং তাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দেখলাম তার কোন কিছুরই যেন অভাব সেখানে নেই।

শয়ন ঘর, পড়ার ঘর, লাইব্রেরী ও সর্বশেষে সাজ পোশাকের ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। একটা কাচের আলমারার মধ্যে থরে থরে সব পোশাক পরিচ্ছদ সাজান। এবং একটা র‍্যাকের উপরে সারি সারি অন্তত দশ জোড়া জুতো। সঙ্গে আমাদের মানিক ও নলিনা দুজনাই যদিও ছিল নলিনীই কিন্তু সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ মানিকের কণ্ঠস্বরে আমি ও কিরীটি দু'জনাই চমকে উঠলাম।

'কুমারদের দু'জোড়া জুতো দেখছি না!'

'কি বলছো মানিক!—'

'হাঁ দেখুন না। সেদিন যে জুতো পরে কুমাররা বেড়াতে গিয়েছিলেন সেই লাল জুতো জোড়াই দেখছি না। অথচ নিজে আমি পরশু ঐ খানেই দেখেছিলাম। রাজা বাহাদুর বলেছেন তাদের কোন কিছু যেন না খোয়া যায়।—'

'লাল জুতো!' বিস্ময়ের সঙ্গে বলে নলিনী।

'হাঁ দাই মা! সেই যে লাল রংয়ের জুতো দাদাবাবুরা পড়তে সব চাইতে বেশী ভালবাসত আপনিই ত কিনে দিয়েছিলেন তাদের।—'

'সত্যিই ত! সে জুতো দু'জোড়া গেল কোথায়?—'

'কিন্তু—'

মানিকের কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বললাম, 'কোথায় আবার যাবে। দেখ কোথাও আছে নিশ্চয়ই!—'

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মানিক বর্ণিত জুতো জোড়া পাওয়া গেল না।

কিরীটি তখন প্রশ্ন করে মাণিককে: কি রকম জুতো ছিল বলুন ত নলিনী দেবী।

'ব্রাউন রংঙের সু—'

'ব্রাউন রঙের সু!—'

অতঃপর কিরীটি যেন কিছুক্ষণ কি ভাবল মনে মনে।

'এঘরে এর মধ্যে কে কে প্রবেশ করছে বলতে পারেন নলিনী দেবী?' কিরিটি প্রশ্ন করে।

'চাবিত মানিকের কাছেই ছিল ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।'

'এঘরের চাবি তোমার কাছে ছিল মানিক?—'

'হাঁ! কুমারদের মৃত্যুর পর হ'তে চাবি আমার কাছেই আছে। কেবল দিনে একবার করে এসে সব ঝেড়েপুছে ঠিক করে রেখে যাই!—'

'কাল ঝেড়েছিলে?—'

'হাঁ!'

'সব ঠিক ছিল তখন তোমার মনে আছে?—'

'সেই রকমইত মনে পড়ছে!—তবে পর—'

'কাল কখন ঘর পরিষ্কার কর?—'

'দুপুরের দিকে!—'

'সঙ্গে আর কেউ ছিল?—'

'না।—'

'ঘর পরিষ্কার করতে করতে তুমি বাইরে গিয়েছিলে ঘর খোলা রেখে?—'

'হাঁ মামাবাবু ডেকেছিলেন তাই একবার বাইরে গিয়েছিলাম।—'

প্রত্যুত্তরে কিরীটি আর বিশেষ কোন কথাই বললে না।

কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছিলাম,

মাণিকের মুখে কুমারদের ব্যবহৃত ব্রাউন রংয়ের জুতো জোড়ার হারানর কথাটা শোনা অবধি তার মুখে একটা স্পষ্ট চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

দেখতে বাকী ছিল একমাত্র কুমারদের শয়ন ঘরটাই।

সেটা দেখে দু'জনে নিচে নেমে এলাম।

একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটি একটা আরাম কেদারার উপরে দেহটা শিথিল করে এলিয়ে দিল।

আমি ঐ দিনকার ইংরাজী সংবাদ পত্রটা খুলে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিন্তু সংবাদ পত্রে পরিবেশিত সংবাদে যেন মন বসছিল না। এই রাজ প্রাসাদে মাত্র কয়েকদিন আগে দু'টি সুকুমার প্রিয়দর্শন নিষ্পাপ বালককে কেন্দ্র করে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছে, সেই ব্যাপারটাই যেন মনের মধ্যে এসে বার বার ঘোরা ফিরা করছিল। অবিশ্যি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়েই নিষ্পাপ দু'টি বালককে তীব্র বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এবং সোজা সুজি ভেবে দেখতে গেলেই বোঝা যায় যে, অর্থই এ ক্ষেত্রে অনর্থের কারণ। বিষ প্রয়োগের ব্যাপারটাও মনে মনে পর্যালোচনা করলে মনে হয়, প্রয়োগকারী বাইরের কোন তৃতীয়পক্ষ নয়। এবাড়িরই কেউ না কেউ। কারণ কুমারদের নির্দিষ্ট গতিবিধি থেকে এও বোঝা যায়, বাইরের কোন

তৃতীয় পক্ষেরে দ্বারা এ কাজ কখনই ঘটা সম্ভবপর নয়। তাই যদি হয় তবে সন্দেহ জাগছে কার কার উপরে। মিস্ ডারোথি জোন্স, নলিনী, মানিকলাল, ধরণীধর এদের মধ্যেই কেউ না কেউ। কিন্তু কে! দীননাথের কথাটাও আবার একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কুমারদের দেখাশুনার জন্যই এরা মাহিয়ানা পাচ্ছিল। সেদিক দিয়ে কুমারদের হত্যা করলে এরা ত প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া এদের মধ্যে কেউই কুমারদের নিকট আত্মীয় নয় যাতে করে কুমারদের হত্যা করতে পারলে এরা কেউ আর্থিক ব্যাপারে লাভবান হবে।

হঠাৎ কিরীটির কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গল।

'দেখ সুব্রত। আমি যতই ভাবছি ততই যেন মনে হচ্ছে জুতো জোড়া নিশ্চয়ই কেউ চুরী করেছে!—'

'জুতো জোড়া!—'

'হাঁ। কুমারদের সেই ব্রাউন রংয়ের জুতো জোড়া,—'

'ও!—'

আমার চিন্তাধারার সঙ্গে কিরীটির চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় কিরীটির কথায় প্রথমটায় আচমকা সত্যি তাই একটু চমকেই উঠেছিলাম।

'কিন্তু কেন! but why after all that particuler brown pair of shoes should be stolen। কেন চুরী যাবে জুতো জোড়া।—'এবারে মনে হলো কথাটা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেও যেন কতকটা সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন

করছে। জুতো জোড়ার ব্যাপারটা এতক্ষণ মনেই ছিল না। কিরীটির কথায় যেন আবার নতুন করে মনে পড়ল।

'ভেবে দেখ। কুমারদের ব্যবহারের সব কয় জোড়া জুতোই রইলো কেবল চুরী গেল সেই জোড়া যে জোড়া তারা মৃত্যুর আগে শেষবার পায়ে দিয়েছিল।—'

'তুই কি—'

কথাটা আমাকে শেষ না করতে দিয়েই কিরীটি বলে উঠ্‌লো: নিশ্চয়ই। এই হত্যা ব্যাপারের missing link ঐ জুতোর মধ্যেই আছে if I am not wrong। যদি আমার অনুমান না ভুল হয়ে থাকে।

'তোর অনুমানই যদি ঠিক হয়, ত কে আর চুরী করবে, এবাড়িরই কেউ করেছে।—'

'তাত নিশ্চয়ই। রাজা সাহেব থেকে সুরু করে ব্যরিষ্টার সাহেব, নলিনী, মিস জোন্স, মানিকলাল এদেরই মধ্যে কেউ জুতো জোড়া হাতিয়েছেন।—'

হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠলাম কিরীটির কথায়। তবে কি কিরীটি হত্যাকারীকে ধরতে পেরেছে।

প্রশ্ন করলাম: বুঝতে পেরেছিস্ নাকি definitely কিছু?

'না বন্ধু। জুতো problem solve না হওয়া পর্যন্ত এগুতে পারছিনা। কেবলই হোঁচট খাচ্ছি।—'

—ছ—

সমস্ত দ্বিপ্রহরটা কিরীটি শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিল চোখের উপরে হাত চাপা দিয়ে। এবং বোঝা গেল সে শুয়েই আছে ঘুমায়নি।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। সন্ধ্যা রাত্রি সাতটা নাগাদ কিরীটি দেখি গায়ে জামা কাপড় চাপাচ্ছে।

'কোথাও বেরুবি নাকি ?—'

'হাঁ চল বেড়িয়ে আসি !'

গেট দিয়ে বেরুচ্ছি হঠাৎ দেখি রাজার ক্রাইসলার গাড়িটা পাশ দিয়ে বের হ'য়ে গেল।

এবং আশ্চর্য হ'য়ে দেখলাম গাড়ির মাথায় মালপত্র ও ভিতরে বসে মিস্ ডরোথি জোন্স। হঠাৎ যেন কিরীটির শরীরে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহে গেল ! সে বললে : ফিরে চল সুব্রত !

আবার আমরা ফিরে এলাম।

আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহারের জন্য রাজা অন্য একটা গাড়ি ও ড্রাইভার নিযুক্ত করে রেখেছিলেন।

গাড়ি পোর্টিকোর নীচেই ছিল। ড্রাইভারও ছিল গাড়িতে।

সোজা এসে গাড়িতে উঠে বসে কিরীটি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল : স্টেশন চল।

স্টেশনে এসে যখন পৌঁছালাম রাত তখন পৌনে আটটা।

সংবাদ নিয়ে জানা গেল কলকাতার দিকে যাবার গাড়ি ছাড়তে তখনও মিনিট কুড়ি দেরী। এবং গাড়িটা ওইখান থেকেই ছাড়ে।

প্ল্যাটফরমের উপরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। কিরীটি প্রত্যেক কম্পার্টমেণ্টে দৃষ্টি দিতে দিতে এগিয়ে চলল।

কিন্তু কোথায় মিস ডরোথি জোন্স! তার পাত্তাই নেই।

'চল সুব্রত ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং-রুমটা একবার দেখি—'

কিন্তু এবারে আর নিরাশ হ'তে হলো না।

সুইংডোয় ঠেলে ঘরে পা দিতে গিয়েই আমরা থমকে দাঁড়ালাম। পরস্পর পরস্পরের সামনাসামনি হাত ধরে দাঁড়িয়ে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ ও মিস্ ডরোথি জোন্স।

নিঃশব্দে কিরীটি ও আমি সুইংডোরটা ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলাম প্ল্যাটফরমের উপরে।

গাড়ি ছাড়তে এখনো মিনিট দশেক বাকী!

প্ল্যাটফরমের পরে একটা শিরিষ গাছের তলায় দু'জনে দাঁড়িয়ে আছি। দু'জনারই আমাদের দৃষ্টি ওয়েটিং-রুমের দরজার দিকে।

হঠাৎ নজরে পড়লো কিরীটির চাপা কণ্ঠস্বরে দণ্ডায়মান গাড়িটার একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের দরজার সামনে এক কোট-প্যাণ্ট পরিহিত এক সুশ্রী ভদ্রলোকের 'পরে।

ভদ্রলোক ঘন ঘন গেটের দিকে তাকাচ্ছেন।

'ভদ্রলোক কারো জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই সুব্রত!—'

'মনে হচ্ছে তাই!—'

জানিনা তখনো যে তার চাইতেও বড় আর একটি বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

গেট দিয়ে নলিনী দেবী এসে প্রবেশ করলেন হাতে তার একটা লেডিজ হ্যাণ্ড্ ব্যাগ।

নলিনী দেবীকে ঐ সময় স্টেশনে দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। নলিনী দেবী সোজা সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের সামনে দণ্ডায়মান ভদ্রলোকের সামনে এসে হাতের ব্যাগটা তার হাতে দিতেই দ্রুতপদে কিরীটি এগিয়ে গেল সামনে।

এবং কোনরূপ ভূমিকা মাত্র না করে সোজা একেবারে বললে, 'নলিনী দেবী ব্যাগটা আমি চাই!—'

চকিতে নলিনী ফিরে তাকায় কিরীটির দিকে।

দণ্ডায়মান পুরুষটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে: কে আপনি!

'নলিনী দেবী আমায় চেনেন! ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।—'

ভদ্রলোক এবারে অভদ্রভাবে খিঁচিয়ে উঠ্‌তেই একটা গোলমাল শুরু হ'য়ে গেল। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল সেখানে।

হাতাহাতি হবার জোগাড়।

হঠাৎ সেখানে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ এসে হাজির: একি প্রশান্ত! তুমি?

মুহূর্তে যেন সাপের গায়ে মন্ত্র পড়লো। ভূত দেখার মতই চমকে ফিরে তাকাল প্রশান্ত!

'একি! মিঃ রায় আপনি এখানে এসময়ে?—'

'একটু সামান্য হিসাবের ভুল হয়ে গিয়েছে রাজা সাহেব! প্রশান্ত বাবুর হাতের ব্যাগটা আমার চাই! মনে হচ্ছে উনি আপনার পরিচিত!—'

'হাঁ—আমাদের জামাই!—'

'মানে রাজেন্দ্রবাবুর মেয়েকে—'

'হাঁ।—'

'বুঝেছি। নলিনী দেবী কই!—'

'নলিনী!—'

'হাঁ নলিনী দেবীওত এখানে ছিলেন!—'

কিন্তু কোথায় নলিনী সে তখন ত্রিসীমান্তেও নেই

'ব্যাগটা দিতে বলুন রাজা সাহেব ওকে!—'

'ব্যাগটা!'

'হাঁ। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকেত ঐ ব্যাগের মধ্যেই কুমারদের হারান জুতোজোড়া দু'টো পাওয়া যাবে—'

'হারাণ জুতো জোড়া, কি বলছেন আপনি!'—

'হাঁ ব্যাগটা দিতে বলুন দেখাচ্ছি!—'

হতভম্ব বিমূঢ় প্রশান্তর হাত হ'তে এবারে আমিই এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলাম। এবং সত্যিই ব্যাগ খুলতে তার

মধ্যে দু'জোড়া চক্ চকে ব্রাউন রংয়ের জুতো ছোট ছেলেদের পাওয়া গেল।

চিলের মতই যেন ছোঁ দিয়ে কিরীটি জুতো জোড়া দুটো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমরা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক।

সদল বলে আমরা আবার রাজার ক্যাডিলাক গাড়িতে চেপেই প্রাসাদে ফিরে এলাম—একমাত্র নলিনী দেবী বাদে।

তার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

পরের রাত্রে আমরা ফিরে এলাম—প্রশান্তকে দীননাথের হাতে তুলে নিয়ে।

প্রশান্তই শেষ পর্যন্ত সব কিছু স্বীকার করে কিরীটির কাছে।

জুতো পালিশের মধ্যে নাইট্রো-বেনজিন ব্যবহার হয়—সেইটা বেশী পরিমাণ জুতোর কালীতে মিশিয়ে জুতো পালিশ করবার সময় জুতোর ভিতরেও প্রচুর পরিমাণে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পায়ের চামড়া দিয়ে নাইট্রো-বেনজিন এবজরবসন হওয়াতেই কুমারদের মৃত্যু ঘটেছে।

প্রশান্ত ভেবেছিল রাজেন্দ্র বড়ুয়া তাকে তাড়িয়ে দিলেও তার মৃত্যুর পর তার মেয়ে অর্থাৎ প্রশান্তর স্ত্রীই সমস্ত সম্পত্তি পাবে এবং বেণু ও রুণুকে যদি ও সরিয়ে ফেলতে পারে তাহলে

টিকেন্দ্রজিতের যাবতীয় সম্পত্তিও তারই হস্তগত হবে একদিন। তাই সে স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করেনি এবং পূর্ব পরিচিত নলিনীকে সে নিযুক্ত করেছিল টিকেন্দ্রজিতের প্রাসাদে। নলিনীর সঙ্গে প্রশান্তর পরিচয় হয় কলকাতায়। তারপর টিকেন্দ্রের ওয়ালটিয়ারে যাবার সব ব্যবস্থা হচ্ছে জেনে পূর্বাহ্ণেই নলিনীকে ওয়ালটিয়ারে পাঠিয়ে দেয় প্রশান্ত এবং সহজেই নলিনী সুনন্দার মন জয় করে নিয়ে তার সঙ্গে চলে আসে।

প্রশান্তর প্রথমে ইচ্ছা ছিল নলিনীর রূপ-যৌবন দিয়েই রাজা টিকেন্দ্রজিতের কাছ হতে কিছু অর্থ আগে বাগিয়ে নেওয়া কিন্তু নলিনী তাতে সক্ষম হয় না। ইতিমধ্যে একটা মার্ডার কেসে জড়িত হয়ে রাতারাতি প্রশান্ত কলকাতা ছেড়ে বর্মায় গিয়ে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়। আট বৎসর বাদে ফিরে এসে, প্রশান্ত যখন দেখলে নলিনী তখনও তার পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে পারেনি তখন সে কুমারদের ধ্বংসের পরিকল্পনা করে নতুন উদ্যমে। কেমিস্ট্রিতে ডকটরেট—তাই সে অপূর্ব পন্থা গ্রহণ করেছিল কুমারদের শেষ করবার জন্য।

কিন্তু ভুল করলে সে কুমারদের মৃত্যুর সাত আট দিন পরেই এসে নলিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে গিয়ে।

সে রাত্রে উদ্যানে নলিনীও প্রশান্তর মধ্যেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

কিরীটির প্রথমে সন্দেহ হয় ফটোতে কুমারদের পায়ে আলতা পরার মত একটা শেড দেখে। অনেক ভেবে সে বুঝতে পারে একমাত্র ওরকম দাগ হতে পারে জুতো পরা থেকে।

এবং জুতোর কাঁচা রং থাকলে। কিন্তু রাজার ছেলের জুতো, কাঁচা রংয়ের হবে না। অতএব তার মনে হয় নিশ্চয়ই জুতোর ভিতরে রং দেওয়া হয়েছিল। এবং নিশ্চয়ই ঐ জুতোর রঙের ভিতর দিয়ে নাইট্রো-বেনজিন বিষ দেহে সংক্রামিত করা হয়েছে। কারণ সে নিজে কেমিস্ট্রির ছাত্র, জানতো জুতোর কালিতে নাইট্রো-বেনজিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে ingridiant হিসাবে।

মনের মধ্যে ব্যাপারটা তার আরো দৃঢ়বদ্ধ হয় মানিকের মুখে জুতো চুরির সংবাদ পেয়ে।

॥ ২ ॥

কিরীটি টিকেন্দ্রজিতের কেসে আসাম যাবার পূর্বে কৃষ্ণা বৌদীকে কথা দিয়েছিল ফিরে এসে কোথায়ও না কোথায়ও তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই ভ্রমণেই সংগী হ'তে হয়েছিল আমাকেও, এবং নানা স্থান ঘুরে শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে গিয়ে ফিরবার সময় কৃষ্ণা দিল্লীতেই থেকে গেলো তার এক দূর আত্মীয়ার ওখানে কিছুদিনের জন্য, ফিরছিলাম তাই আমি আর কিরীটি দু'জনেই কলকাতায়।

৭৪-ডাউন দিল্লী-মেলটা প্রায় পৌণে তিন ঘণ্টা লেট রাণ্ করছিল। নেক্সট্ স্টপেজ এলাহাবাদ। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, বেলা প্রায় পৌণে-পাঁচটা। টাইম মেক-আপ করবার জন্য ট্রেণটা ছুটেছে যেন ঝড়ের বেগে। বাইরে শীত-অপরাহ্ণের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিরীটির দিকে আড়-চোখে তাকালাম—নীচের বার্থের পিছন দিকে হেলান দিয়ে পা দু'টো লম্বালম্বিভাবে ছড়িয়ে আপন-মনে টাইম-টেবিলের পাতা উল্টোচ্ছে সে।

হঠাৎ চলন্ত ট্রেণখানা বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'ব্যাপার কি! হঠাৎ থামলো কেন রথ?—' বলতে বলতে খোলা জানলা দিয়ে কামরা থেকে মুখ বের করে বাইরের দিকে তাকালাম।

কিন্তু কৈ, কিছু না! চোখে পড়লো শুধু কতকগুলো কৌতূহলী নারী-পুরুষের মুখ! গাড়ির নানা কামরা থেকে বাইরে উঁকি মেরেছে!

কিরীটির কণ্ঠস্বর আবার কাণে এলো: হুঁ! আয় সুব্রত, ছাখ—অনুভূতি আমার কথনো আজ পর্যন্ত মিথ্যা হয়নি!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম গাড়ির অন্যদিকের জানলার সামনে, কিরীটি যেদিককার একটা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখি, ট্রেণের পাশে লাইনের উপরে চার-পাঁচ-জন যাত্রী একজায়গায় জড়ো হয়ে লাইনের ধারে জমিতে কি যেন দেখছে!

কিরীটি ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলে নীচে নেমে পড়েছে!

আমিও অনুসরণ করি সকৌতুহলে তাকে।

আমাদের কামরাটা গাড়ির মাঝামাঝি। ভিড় জমেছে গাড়ির প্রায় শেষ দিকে।

এ্যাংলো-গার্ড-সাহেব ইতিমধ্যে তার কামরা থেকে নেমে এগিয়ে এসেছে।

একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করি,—'ব্যাপার কি, মশাই?'

—'এ্যালার্ম টেনে গাড়ি থামিয়েছে,—কোনো এ্যাকসিডেণ্ট ট্যাকসিডেণ্ট হবে বোধ হয়!'

আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে সেখানে যাত্রীর ভিড় আরো জমে উঠেছে।

ভিড়ের ভিতর থেকে চাপা একটা গুঞ্জন কাণে এলো।

আপ আর ডাউন দুটো লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক চিৎ হয়ে পড়ে আছেন।

পরণে দামী মিহি ঢাকাই ধুতি, গায়ে শাদা ভায়েলার পাঞ্জাবী, পায়ে দামী চক্‌চকে পেটেণ্ট-লেদার পাম্পস্থ, হাতে দামী রিষ্ট-ওয়াচ।

একটা হাত পিঠের নীচে চাপা পড়েছে—অন্য হাতখানা পাশে ছড়ানো। সেই হাতের তিন আঙ্গুলে সোনার তিনটি আংটি।

মাঝের আংটিটায় বোধহয় হীরা বসানো—ম্রিয়মাণ-সন্ধ্যা-লোকেও ঝিক-মিক করছে।

পনেরো-কুড়ি জন নানা-বয়সী পুরুষ যাত্রী চার পাশে ভিড় জমিয়েছে।

মাটীতে পড়ে নিশ্চল নিষ্কম্প দেহটা—সেদিকে তাকালেই বুঝতে দেরী হয় না, লোকটি মারা গেছে।

মৃতদেহের পাশে ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের একজন যুবক কালো রংয়ের সার্জের প্যাণ্ট পরা, গায়ে গরম হাফ-সার্ট অচঞ্চল দৃষ্টিতে ভূপতিত দেহটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একেবারে অতি নিকটে। যুবকের হাতে সোনার রিষ্টওয়াচ, চোখে সোনার চশমা।

গার্ড সাহেবের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, মৃতদেহ ঐ যুবকটিরই কাকার।

ফার্ষ্ট ক্লাশ একটা কুপে রিজার্ভ করে উক্ত যুবক সাধন

সরকার ওর কাকা ভূপেন সরকারকে নিয়ে দিল্লী থেকে আসছিলেন।

ভূপেন সরকার মানে, স্যর ভূপেন্দ্রনাথ সরকার দিল্লীর প্রচণ্ড ধনী মার্চেণ্ট। কিছুদিন হলো মাথার গোলমাল হওয়ায় দিল্লীর ডাক্তারদের পরামর্শে চিকিৎসা করাবার জন্য ভাইপো তাঁকে নিয়ে এলাহাবাদ হ'য়ে কলকাতায় আসছিলেন।

সাধন সরকার সমস্তক্ষণই প্রায় কাকাকে চোখে-চোখে রাখছিলেন। কাল সারা রাত ঘুমোন নি। এখন যেমন একটু তন্দ্রার মত এসেছে—অমনি আচম্‌কা দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে কাকা ঝাঁপ দিয়েছেন।

কম্পার্টমেণ্টে সাধন সরকার, ওর কাকা স্যর ভূপেন্দ্র সরকার এবং সাধন সরকারের আট-দশ বছর বয়সের পুত্র বাবুল ছিল।

দুর্ঘটনার সময় বাবুল বার্থে ঘুমিয়ে ছিল।

সাধন সরকারের চোখ-মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, আকস্মিক অভাবিত দুর্ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন! ব্যাপারটা এমন আচম্‌কা আর আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে বাধা দেবারও অবকাশ পেলাম না!'—ধরা গলায় সাধন সরকার বললেন।

আসন্ন শীত-সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে প্রকৃতির বুক থেকে শেষ আলোর চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত ততক্ষণে যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে!

মৃদদেহটা ধরাধরি করে স্যর ভূপেন্দ্রনাথের রিজার্ভ কূপেতেই আবার তুলে দিয়ে গার্ড গাড়ি ছাড়বার নির্দ্দেশ দিল।

যাত্রীরাও গুঞ্জন করতে করতে যে যার নিজের নিজের কামরার দিকে ছুটলো।

আমরাও গেলাম।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ির কামরার আলো জ্বলে উঠেছে, আমাদের কামরায় আমি, কিরীটি আর একজন মধ্যবয়সী গুজরাটি ভদ্রলোক।

গুজরাটি ভদ্রলোকটি বেশ মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস। গাড়িতে ওঠা ইস্তক দেখছি ভদ্রলোক কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। মধ্যে মধ্যে দু'চারবার অতি-কষ্টে নিদ্রাজড়িত চক্ষু মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছেন,—'গাড়ি মোগল-সরাই পৌছে গেল বাবু-সাব? হামি কাশী যাবে। মোগলসরাইমে উৎরবে।'

প্রতিবারই আমি বলছি, 'মোগল-সরাই এলে আপনাকে উঠিয়ে দেবো।—'

আমরা গাড়িতে উঠতেই ভদ্রলোক আবার সেই প্রশ্ন করলেন—'গাড়ি মোগল-সরাই পৌঁছুলো বাবুজী?'

'না নিদ্ যাইয়ে—মোগলসরাই আভি দূর—' কিরীটি এবার জবাব দিল।

এলাহাবাদ স্টেশন আর বেশী দূর নয়, এবারে এলাহাবাদ—

কিরীটি সিগার-কেস থেকে একটা সিগার নিয়ে তাতে অগ্নি-সংযোগ করলো।

কিরীটির চোখের দৃষ্টিতে যেন অন্যমনস্ক-ভাব! বুঝলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা ওর মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে!

'কিরীটি— ?'

আমার ডাকে কিরীটি আমার দিকে জিজ্ঞাসুভাবে দৃষ্টি ফেরালো।

'তোর মনের intuitionটা বেশ সময় মাফিক লেগে গেল।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিছিলি সু, স্যার ভূপেনের দেহে— ?'

'কি ?'

'ও-রকম একটা accident-এ লোকটার মৃত্যু হলো—প্রায় চল্লিশ মাইল রেটের চলন্ত ট্রেণ থেকে পড়ে গিয়ে! কিন্তু সে হিসাবে দেহে চোট-জখম কোথায় ?'

চম্‌কে উঠ্‌লাম কিরীটির কথার ধরণে। নিমেষে মনে সন্দেহের কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো!

গাড়ির গতি তখন মন্থর হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে, দূরে এলাহাবাদ স্টেশনের আলোক-মালা চোখে পড়ে।

দেখতে দেখতে গাড়ি এলাহাবাদ স্টেশনে এসে পৌঁছুলো।

'কি বলছিলি কিরীটি ?' প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'মৃত্যুটা ঠিক দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না সুব্রত!'

মৃদু কণ্ঠে কিরীটি জবাব দিল।

'তাহলে ?'

'হাঁ। অবশ্য সরকারের সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে—চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ায় মৃত্যু! উহুঁ। সহজভাবে মেনে নিতে পারছি না সুব্রত!' বলে পরক্ষণেই যেন ওর বক্তব্য শেষ করলে: কাকা মরেছে, বুঝুক ভাইপো! মিথ্যা আমাদের খানিক আরো দেরী করিয়ে দিলো। একে ট্রেণটা ঘণ্টা-তিনেক লেট্ রাণ করছিল—তার সঙ্গে যোগ হলো আরো তিন কোয়ার্টার। ভাবছি, এক কাজ করলে হয়।

'কি ?'

'কাশীতে ত শিউশরণ আছে। সেখানে দুটো দিন থেকে গেলে কেমন হয় ?'

'আপত্তি কি ?—হাতেও এমন কোন কাজ নেই যে কালই কলকাতায় ফিরতে হবে।'—জবাব দিলাম।

'তবে সেই ভালো! হল্ট্ এ্যাট বেনারস্—বিশ্বনাথ-কি জয়।'

হঠাৎ বার্থে-শায়িত গুজরাটি ভদ্রলোক কিরীটির কথায় প্রায় লাফিয়ে উঠে বসে, 'ক্যা হুয়া বাবুজী? মোগল-সরাই আগেয়ি ?'

'হাঁ, আভি আয়েগা!—বিস্তারা-উস্তারা বাঁধ্ লিজিয়ে!'—কিরীটি হাসতে হাসতে বলে।

ট্রেণ তখন প্ল্যাট্ফর্মে ঢুকছে।

—খ—

গাড়ি স্টেশনে থামতে কিরীটি বললে, 'বল্লভদাশের লোক পেলে চা দিতে বলো সুব্রত!'

কিরীটি বলবার আগেই আমি গাড়ির দরজা খুলে নামবার উদ্যোগ করছিলাম। গাড়ী থেকে সবে প্ল্যাটফর্মে নেমেছি, পরিচিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সামনের দিকে তাকালাম।

'কে! কিরীটি না?'

বক্তা আমাদের সেই বেনারসের শিউশরণ একটু আগেই যার কথা হচ্ছিল। শিউশরণের পরণে পুলিশের পোষাক। তার পাশে দাঁড়িয়ে দুইজন রেলওয়ে পুলিশ।

'আরে শিউশরণ!—' আমি আর কিরীটি দু'জনে একসঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করি। এবং কিরীটি বার্থ থেকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

দু'জনে প্ল্যাটফরাম নেমে শিউশরণের পাশে এসে দাঁড়ালাম।

শিউশরণ আমাদের দিকে ফিরে বললে,—'এক মিনিট, ভাই!'—তারপর পাশের রেল-পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললে: তোমরা ততক্ষণ ব্রেক-ভ্যানটা একবার খোঁজ করে দেখগে। আমি আসছি।

পুলিশ দু'জন চলে গেল।

'কি ব্যাপার হে ?' প্রশ্ন করলাম।

'আর বল কেন খবর পেয়েছি, বনশীলালের লোক এই ট্রেণে পেশোয়ার থেকে চোরাই-আফিম্ নিয়ে আসছে।—লোকটাকে ধরবার জন্য গত আট মাস থেকে হন্নে হয়ে বেড়াচ্ছি।'

'তুমি বুঝি এখন এলাহাবাদেই পোষ্টেড্ ?' কিরীটি প্রশ্ন করে।

'হাঁ। এলাহাবাদে মাস-কয়েক হলো বদলি হয়ে এসেছি। বিশেষ করে ঐ বনশীলালের জন্যই।'

'রাম, রাম, ইনেসপেক্টার-সাব্!—' মিহি মেয়েলি গলায় আকৃষ্ট হয়ে যুগপৎ সকলে আমরা পাশের দিকে ফিরে তাকালাম।

ঢিলা পায়জামা, তার উপর গরম পাঞ্জাবী আর জহর-কোট পরিহিত, মাথায় জরির শালের টুপি, লম্বা-চওড়া এক লোক আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে।

গোঁফের দুই প্রান্ত ছুঁচোর ল্যাজের মত পাকানো ঃ লোকটার মুখে হাসি কিন্তু অত্যন্ত কুৎসিত। শিউশরণের দিকে তাকিয়ে দেখি, অবরুদ্ধ ক্রোধে তার সমস্ত মুখ যেন বেগুনি হয়ে উঠেছে! শিউশরণ জবাব দিলে না। লোকটা কানকাটার মত হাসতে লাগলো।

এমন সময়ে দেখা গেল স্টেশন-মাস্টার আর গার্ড হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছেন। শিউশরণকে দেখতে পেয়ে স্টেশন-মাস্টার বলেন—'আরে ইনেসপেক্টার সাব! ট্রেণে একটা accident হয়েছে।'

'এ্যাকসিডেণ্ট্? কিসের?'

কিরীটি ঠিক শিউশরণের পাশে দাঁড়িয়েছিল; চাপা গলায়, অপরে না শোনে, শিউশরণকে বললে, 'এ্যাকসিডেণ্ট নয়! মার্ডার!'

চম্‌কে শিউশরণ আর আমি দু'জনেই কিরীটির মুখের দিকে তাকাই।

শিউশরণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। মুহূর্তে সে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে স্টেশন-মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি এগোন, মিস্টার চৌবে আমি আসছি!'

'আসুন, দেরী করবেন না!' বলতে বলতে গার্ড সাহেবকে সঙ্গে করে স্টেশন-মাস্টার গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে এক সময় বনশীলাল যে কখন সরে পড়েছে, টের পাইনি।

'কি ব্যাপার বলোতো রায়?' শিউশরণ প্রশ্ন করে।

'সব জানি না! ঘটনা থেকে যতটুকু বুঝতে পারছি···স্যর ভূপেন সরকার দিল্লীর বিখ্যাত ধনী মার্চেণ্ট। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে!'

'হত্যা! তবে যে স্টেশন-মাস্টার বললে, accident!'

'না। এ্যাকসিডেণ্ট নয়। হত্যা করে তাকে চলন্ত ট্রেণের চেন টেনে গতি কমে আসায় ঐ সময় tactfully কামরা থেকে

ফেলে দেওয়া হয়েছে—যাতে মনে হবে যে, ভদ্রলোক মস্তিস্ক-বিকৃতিতে ভুগছিলেন—তাই আত্মহত্যা করেছেন মস্তিস্ক-বিকৃতির ফলে চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে পাগলামার ঝোকে।'

'বলো কি ?'

'হ্যাঁ। এখন বাকী যা, তা তোমার করনীয়! অবশ্য মৃতদেহটা একটু ভালো করে পরীক্ষা করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে! সে যাক এ দিকে যে আমরা ভেবেছিলাম তুমি কাশীতে আছো, তাই তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

আনন্দে শিউশরণ বলে—'তাই নাকি? তবে মালপত্র নামাও!'

বলতে বলতে নিজেই কুলি ডেকে আমাদের মালপত্র নামিয়ে ফেললো।

ইতিমধ্যে সেই রেলওয়ে-পুলিশ দু'জন ফিরে এসেছিল। তারা এসে রিপোর্ট দিল ব্রেকভ্যান তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও সন্দেহ করবার মত কিছু মেলেনি।

গ

স্টেশন-মাস্টার আর গার্ড-সাহেব কুপের মধ্যে মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিউশরণের প্রতীক্ষায়।

গাড়ির কুপের খোলা দরজার সামনে আমাদের এগিয়ে যেতে দেখেই স্টেশন-মাস্টার পিয়ারীলাল বারেকের জন্য আমার আর

।করাটের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা এখানে কি চান ?'

শিউশরণ বুঝলো, কুপের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে সে বললে, 'ওরা আমার লোক পিয়ারীলাল, আমার সঙ্গে এসেছে।'

গার্ড সাহেব তাঁর মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—'আর দেরী করা যায় না। একে গাড়ি তিন ঘণ্টার উপর লেট রাণ করছে। ডেড বডিটা নামিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাই করুন।'

গাড়ি থেকে দেহ নামাবার ব্যবস্থা করতে নেমে গেলেন পিয়ারীলাল।

'আপনার নামটা জানতে পারি ?'—গার্ডকে জিজ্ঞাসা করলো শিউশরণ।

'আলফ্রেড্ চ্যাটার্জী।'

গার্ড-সাহেব নেটিভ্ ক্রিশ্চান।

'আপনার জবানবন্দি,—যা দেখেছেন, বলুন।'

'গাড়ি থামতেই এঞ্জিনের কাছাকাছি এগিয়ে দেখি—তুটো লাইনের মাঝখানে মৃতদেহ পড়ে আছে। যাত্রীরা চারপাশে ভিড় করেছে! তারপর মৃতের ভাইপো ঐ মিস্টার সরকারের মুখে শুনলাম, ইদানীং কিছুদিন যাবৎ ভদ্রলোকের নাকি মস্তিষ্কে কিছু বিকৃতি ঘটেছিল—তাই ট্রিটমেণ্ট করাতেই ভাইপো এলাহাবাদ হ'য়ে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে। এমন সময় হঠাৎ বিভ্রাট চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছেন।'

'আপনার গাড়ি লেট রাণ করছিল কেন ?'

'পথে এঞ্জিনের গোলমাল হয়েছিল।'

ইতিমধ্যে কিরীটির দিকে তাকিয়ে দেখি, সে এগিয়ে গিয়ে পাশের বার্থে যেখানে সাধন সরকারের ছেলে বাবুল তখনও ঘুমোচ্ছে, তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে ঘুমন্ত বাবুলের দিকে তাকিয়ে আছে।

ছেলেটির বয়স দশ বছর হলেও বয়সের হিসাবে বেশ একটু হৃষ্ঠপুষ্ট বাড়ন্ত গড়ন।

দেখলে বারো তেরো বছরের ছেলে বলেই মনে হয়।

হঠাৎ কিরীটির কণ্ঠ-স্বরে একটু চমকিত হলাম।

ঘুমন্ত ছেলেকে ডেকে কিরীটি বলছে, 'তোমার নাম কি খোকা ?'

কিরীটিকে বাধা দিল সাধন সরকার, 'ওর নাম বাবুল। কাল সারা রাত পেটের ব্যথায় ঘুমুতে পারিনি, এখন একটু ঘুমুচ্ছে—ঘুমোতে দিন।'

'আপনার ছেলে তো ঘুমোচ্ছে না। অনেকক্ষণ থেকেই জেগে আছে দেখছি!' মৃদু হেসে কিরীটি জবাব দেয়।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কিরীটির কথায় সাধন সরকারের সমস্ত মুখখানা যেন মুহূর্তের জন্য কালো এবং সঙ্গে সঙ্গে থম্-থমে হয়ে উঠলো।

নির্বাক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সাধন সরকার কিরীটির মুখের দিকে।

পর-মুহূর্তে চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জন করে ওঠে সাধন সরকার, 'কে মশাই আপনি? বলা নেই, কওয়া নেই, হুট করে আমার রিজার্ভ কুপেতে এসে উঠেছেন! নেমে যান বলছি শীগগির এ কুপে থেকে—যান।'

'তার আগে মিস্টার সরকার, আপনাকে আমি গ্রেফ্‌তার করছি।—You are under arrest!'

শিউশরণের নাটকীয় উক্তিটা আমাকেও স্তম্ভিত করে দেয়।

মুহূর্তে সাধন সরকরের মুখখানা চুপসে গেল। ক্ষণপূর্বের সে আস্ফালন যেন কোন যাদুমন্ত্রে উরে গিয়েছে!

কোনো মতে একটা ঢোক গিলে সাধন সরকার বললে, 'আমাকে arrest করছেন! তার মানে? আপনি হতে পারেন পুলিশের লোক—কিন্তু—'

'আপনার যা বলবার মিস্টার সরকার, আপনার জবানবন্দি নেবার সময় বলবেন। আপাততঃ আপনি under arrest!'

'কিন্তু আমার অপরাধ?'

'স্যর ভূপেন্দ্রনাথকে আপনি হত্যা করেছেন সন্দেহে আপনাকে arrest করা হচ্ছে!' ধীর শান্তকণ্ঠে শিউশরণ কথাগুলো উচ্চারণ করে।

'তার মানে? আপনি বলতে চান, আমি আমার কাকাকে হত্যা করেছি?'

'নিজের কাকা বলেই হয়ত প্রীতিটা একটু বেশী প্রকাশ হ'য়ে গিয়েছে, পরের কাকা হলে হয়ত অতটা হতো না। সে-কথা যাক, আপনার যা বলবার, থানায় গিয়ে বলবেন!'—

'থানায় গিয়ে বলবো মানে? আমার কাকা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছেন।—an accident!'

'সেটা প্রমাণ-সাপেক্ষ—' শিউশরণ জবাব দেয়।

'প্রমাণ-সাপেক্ষ মানে? ট্রেণের সব যাত্রীই ত এ ব্যাপার দেখেছে—'

'হাঁ দেখেছে ঠিক। তবে ঠিক আপনার কাকা লাফিয়ে পড়বার সময়ত দেখেনি কেউ—দেখেছে তার পরের ব্যাপারটুকু।'

শিউশরণের কথার বাঁধুনী দেখে বিস্ময় মানছিলাম।

'এসব আপনি কি বলছেন ইনেস্‌পেক্টর?—' শেষবারের মত যেন অগাধ জলে ডুবতে ডুবতে হাতের কাছে শেষ তৃণটুকু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা পান—সাধন সরকার।

'হাঁ! ময়না-তদন্তে সে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আগে সেটা হোক, তারপর আপনার কথা শুনবো।'

ঘ

'জি. আর. পি.' পুলিশের অফিস ঘরে মৃতদেহ স্ট্রেচারে করে ব'য়ে আনা হলো।

টিম্ টিম্ করে ঘরের মধ্যে জ্বলছে কম পাওয়ারের একটা বৈদ্যুতিক বালব্। আলো এত কম যে অদ্ভুত একটা আলো-ছায়ার রহস্য যেন থম্ থম্ করছে ঘরটার মধ্যে।

স্টেশন-মাস্টারের ঘরেই সাধন সরকার আর তাঁর পুত্র বাবুলকে পুলিশের হেফাজতে বসিয়ে রেখে আসা হয়েছে।

টর্চ হাতে আমি, কিরীটি আর শিউশরণ তিনজনে মিলে নীচের অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। টর্চের আলোটা মৃতদেহের ওপর আমাকে ফেলতে বলে কিরীটি ঝুঁকে পড়ে দেহটা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে সুরু করলে।

প্রথমেই কিরীটি মৃতের জামার বোতামগুলো খুলে দিলে: ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের বেশী হলেও দেহের বাঁধুনি অটুট আছে এখনও—চামড়ায় কোথাও এতটুকু কোঁচ নেই। মসৃণ চর্ম, প্রশস্ত রোমশ বক্ষপট। মুখের রঙ অনেকটা তামাটে হলেও গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মত।

মুখে দু'চার জায়গায় সামান্য ছেঁচড়ে যাবার দাগ ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশে বিশেষ কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। কেবল

মাথার পিছনের চুল-শুদ্ধ খানিকটা চামড়া ধাক্কা খেয়ে উঠে গিয়েছে। ডান হাতের উপরের হাড়টা ভাঙ্গা। বাঁ হাতের কনুইএর কাছে ছোট চৌকো সাইজের একটুকরো 'এ্যড্‌হেসিভ প্লাষ্টার' লাগানো।

কিরীটি সন্তর্পণে প্লাষ্টারের টুক্‌রোটা টেনে তুলে ফেললো : আধ ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত-চিহ্ন একটা প্রকাশ পেল সেই জায়গায় সে ক্ষত-চিহ্ন দেখে মনে হয় যেন কোনো ধারালো কিছুতে আচমকা খোঁচা খেয়ে সেটা হয়েছে। এবং ক্ষত স্থানটা টাটকা—দশ-বারো ঘণ্টার বেশী হয়নি বলেই মনে হয়!

ফিরে আবার ভাল করে পরীক্ষা করেও শরীরের আর কোথাও বিশেষ কোনো ক্ষত-চিহ্ন পাওয়া গেল না শুধু মাথায় দু'চার জায়গায় ছোট খাটো দু'চারটে ক্ষত ছাড়া!

এ্যড্‌হেসিভ্‌ প্লাষ্টারের টুকরোটা মৃতের ক্ষতস্থান থেকে সন্তর্পণে টেনে তুলে কিরীটি একটা কাগজে মুড়ে সযত্নে জামার পকেটে সেটা রাখলো।

ফিরে এলাম আমরা স্টেশন-মাষ্টারের ঘরে আবার।

ঘরে ঢুকে দেখি, সাধন সরকার নিম্নকণ্ঠে তার ছেলের সঙ্গে কি কথা বলছেন।

আমাদের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সাধন সরকার চুপ করে গেলেন এবং সোজা হয়ে বসলেন।

ঘরের একপাশে সরকারের বেডিং দুটো হোল্‌ডঅলে বাঁধা, দুটো বড় চামড়ার স্যুটকেশ এবং একটা এটাচী-কেশ।

সাধন সরকারই শিউশরণকে সম্বোধন করে কথা বললে, 'ইনেস্‌পেক্‌টর, আপনার তাহ'লে সত্যিই ধারণা, আমার কাকার মৃত্যু accidental নয়?'

'আপনার প্রশ্নের জবাব মৃতদেহের ময়না-তদন্ত হলেই পাবেন। সেজন্য কালকের দিনটা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে—' শেষের দিকে শিউশরণের কথায় যেন একটু চাপা শ্লেষ।

স্যর ভূপেন্দ্র সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারে কিরীটির একটি মাত্র ইঙ্গিত শিউশরণের মনে অনেকখানি কাজ করেছে বুঝতে পারলাম।

কিন্তু কেন জানি না, সাধন সরকারকে আমি হত্যাকারী বলে ঠিক যেন মেনে নিতে পারছিলাম না। এ-কথা সত্য যে দুর্ঘটনাটিকে সমগ্রভাবে বিচার করে দেখলে, সাধন সরকারকে সন্দেহের অতীত বলে মনে হয় না!

কিরীটির কথায়-বার্তায় বা হাবে-ভাবে এখনো এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যাতে সাধন সরকারকে শিউশরণের মত সোজাসুজি অভিযুক্ত করা যেতে পারে। কিরীটি এখনো পর্যন্ত সাধন সরকারকে একটি মাত্র প্রশ্ন ছাড়া দ্বিতীয় প্রশ্নই করেনি।

সে অন্য রাস্তা নিয়ে নিশ্চয় মীমাংসার চেষ্টা করছে!

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, কিরীটি চোখ-ইশারায় শিউশরণকে কাছে ডাকলো এবং কি যেন ফিস ফিস করে বললো!

পরে দেখলাম শিউশরণ সাধন সরকারের কাছে গিয়ে নানা প্রশ্ন করতে সুরু করল। এবং কিরীটির কথামত শিউশরণ প্রথমে সাধন সরকারের যা বলবার ছিল, শুনলো।

সাধন সরকারের বক্তব্য থেকে বিশেষ কিছু জানা গেল না। সেই পুরোনো কথা, কাকার মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্য ইত্যাদি।

সাধন সরকার বিপত্নীক। দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেন নি, দশ বছরের ছেলে বাবুলই সংসারে তার একমাত্র বন্ধন। স্যর ভূপেন্দ্র বিবাহ করেন নি। মস্ত ব্যবসা ছাড়া ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা—কলকাতায় আর দিল্লীতে দু'খানা প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন সাধন সরকার!

শিউশরণ সাধন সরকারকে বললে, 'এবার আপনার বাবুলকে আমরা কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, মিস্টার সরকার!'

'বেশ করুন।'

'আপনি তা হলে একটু বাইরে যান।'

'বাইরে কেন?'

'আপনি অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যান।'

'বেশ।'

সাধন সরকার ছেলের দিকে বারেকের জন্য তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন যেন বেশ অনিচ্ছার সঙ্গেই।

এতক্ষণে কিরীটি মুখ খুললো। বাব্‌লুর দিকে এগিয়ে এলো 'কি নাম তোমার খোকা?'

'বাবুল।' ছেলেটি বেশ চালাক চতুর।

'তোমরা কলকাতাতেই থাকো না?' কিরীটি প্রশ্ন করে।

'হাঁ।'

'কোন্ ক্লাশে পড়ো?'

'ক্লাশ সেভেন।'

'দিল্লীতে বুঝি বেড়াতে গিয়েছিলে?—কিন্তু এখন তো তোমাদের ছুটি নয়?'

'না!'

'স্কুল কামাই হলো তো?'

'বাবাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। বাবা দিল্লী গেলেন, তাই আমিও সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

'তোমার দাদু তোমাকে খুব ভালবাসতেন না?'

'হাঁ!—দাদু এবার আমাকে কলকাতায় গিয়ে একটা সাইকেল কিনে দেবেন, বলেছিলেন।' শেষের দিকে বাবুলের গলা কেমন ধরে আসে!

'তার জন্য কি! বাবাকে বলো, বাবা কিনে দেবেন।'

'হ্যাঁ, বাবা কিনে দেবে? বাবা কিছু দেয় না।'—কথাটা বলেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায় বাবুল! বলেঃ বাবাকে বলবেন না কিন্তু—বাবা মারবে।

'না। বলবো কেন? একটা এয়ারগান তোমার চাই বুঝি?'

'ভন্তুর আছে, শিবুর আছে—আমার নেই। ওদের কাছে চাইলেও ওরা দেয় না।'

'আমার বাড়ীতে একটা এয়ার-গানের চাইতে ভালো বন্দুক আছে। আমি দেবো সেটা তোমাকে।'

'দেবেন?—তাহলে এত-বড় একটা দিতে হবে কিন্তু।' অপ্রত্যাশিত আনন্দে বাবুলের চোখের মণি দুটো চক্-চক্ করে ওঠে।

'দেবো।'

'কিন্তু—' হঠাৎ বাবুলের মুখের চেহারা কেমন যেন মলিন হয়ে যায়!

'কি?' বিস্মিতভাবে কিরীটি ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

'বাবা নিতে দেবে না।' মৃদু কণ্ঠে সে বলে।

'আমি দিলে তোমার বাবা কিছু বলবেন না।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। তোমার বাবার আমি অনেক দিনের বন্ধু!'

'তবে বাবা ও-কথা বললে কেন?'

'কি কথা?'

'না, আমি বলবো না!' ভয়ে যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে বাবুল হঠাৎ।

'বলোই না।' কিরীটি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সাহস দেয়।

'না। বাবা বকবে।'

'কিছু ভয় নেই তোমার, বলো!'

'বাবা বলেছে, আপনারা ভালো লোক নন। আপনাদের

সঙ্গে বেশী কথা বলতে········।' কোনো মতে সন্তর্পণে কথাগুলো যেন না উচ্চারণ করেই শেষ পর্যন্ত থেমে যায় বাবুল।

কিরীটি হাসে। ব্যাপারটা যেন কিছু নয়, এমনি ভাব। তারপর হঠাৎ এক সময় আবার প্রশ্ন করে,—'আচ্ছা, আর একটা কথার জবাব দাও তো! তোমাদের গাড়িতে তোমার দাদু, তোমার বাবা আর তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল?'

'একজন লক্ষ্ণৌয়ে উঠেছিলেন কিন্তু মাঝখানে নেমে যান।'

'কেন, তুমি তাকে নামতে দেখনি গাড়ি থেকে?....'

'না। তার গাড়িতে ওঠবার কিছুক্ষণ পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি।—ঘুম ভেঙ্গে তাকে আর আমি দেখিনি!'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলে?'

'অনেকক্ষণ।'

'যে লোকটা তোমাদের গাড়িতে উঠেছিল, তার গায়ে লাল রঙের আলোয়ান বা শাল ছিল কি?'

'হাঁ।'

'তাকে দেখলে চিনতে পারো?'

'তিনি মেয়েমানুষ। আলোয়ানে মুখ ঢাকা ছিল মুখত তার দেখিনি।'

'ও! আচ্ছা তোমাদের রিজার্ভ করা গাড়িতে তোমার বাবা তাকে উঠতে দিলেন যে বড়? নেমে যেতে বলেননি?'

'না!'

'তোমার দাদুও কিছু বললেন না?'

'দাদু ত তখন ঘুমোচ্ছিলেন।'

'তুমি বুঝি সেই লাল আলোয়ানের ঘোমটা দেওয়া মেয়ে-লোকটি গাড়িতে ওঠবার পর ঘুমিয়ে পড়ো?'

'হ্যাঁ! বাবা আমাকে ফ্লাস্ক্ থেকে এক গ্লাস দুধ ঢেলে দিয়ে—সেটা খেয়ে শুয়ে পড়তে বললে। আমি দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি।'

'সে মেয়ে-লোকটি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছিল?'

'না। মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। কথা বলেনি ত।'

'তোমার ঘুম ভেঙেছিল কখন?'

'এই স্টেশনে ট্রেণ ঢোকবার আগে।'

'সে সময় তোমার দাদুকে কামরার মধ্যে দেখনি?'

'হ্যাঁ। দাদু মরে গিয়েছেন তখন।—বাবা বললে, দাদু গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে গেছেন।'

'তোমার দাদুর মাথা খারাপ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

আমরা নিঃশব্দে এ কথা শুনছিলাম। এতক্ষণে জলের মত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বুঝতে পারি, কেন সাধন সরকারকে বাদ দিয়ে বাবুলকে নিয়ে সে পড়েছে।

কিন্তু কে সেই লাল-আলোয়ান-ঢাকা মহিলা? রহস্যজনক-ভাবে গাড়িতে উঠে রহস্যজনকভাবেই অদৃশ্য হলেন মধ্যপথে! শিউশরণের ইচ্ছা ছিল, সাধন সরকারকে আটকাবার কিন্তু কিরীটির মুখের দিকে চেয়ে তা সে করলো না।

শিউশরণ কিরীটিকে বললে, 'ওদের আর নজরবন্দী করে রাখার প্রয়োজন নেই যেতে দাও।'

শিউশরণ সাধন সরকারকে ছেড়ে দিলে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম, সাধন সরকার পরের ট্রেণে কলকাতায় না গিয়ে একটা টাঙ্গায় মালপত্র চাপিয়ে ওখানকার হোটেলের সন্ধানে গেলেন।

সাধন সরকার চলে যাবার পর কিরীটি ওয়েটিং-রুম থেকে বেরিয়ে শিউশরণকে বললে, 'এবার তোমার বাসায় যাওয়া যাক।'

শিউশরণের বাসা স্টেশনের কাছে। ঠিক হলো, দিন দুই তার ওখানে থেকে আমরা ফিরবো।

রাত প্রায় দশটা।

আমি, কিরীটি ও শিউশরণ তার বাসায় বাইরের ঘরে বসে গল্প করছি—পশ্চিমের প্রচণ্ড শীতে জমে যাবার জোগাড়!

এমন সময় সাদা পোষাক-পরা এক পুলিশ অফিসার এলেন—সি-আই-ডি পুলিশ।

'কি খবর, মতি?—' শিউশরণ প্রশ্ন করে।

'প্যালেস-হোটেলেই ভদ্রলোক গিয়ে ওঠেন, এতক্ষণ তাঁর সেই ঘরের দিকে আমি নজর রেখেছিলাম। মিনিট পনেরো হলো দাড়ি-গোঁফওয়ালা এক মুসলমান টাঙ্গা করে হোটেলের সামনে এসে সাধনবাবুর খোঁজ করছেন শুনে, খবর দিতে এসেছি।'

মতির কথা শুনে কিরীটি যেন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'আর এক মিনিট দেরী নয়—এখনি আমাদের হোটেলে যেতে হবে শিউশরণ!'

দশ মিনিটের মধ্যে টাঙ্গায় চেপে প্যালেস-হোটেলে এলাম।

কন্‌কনে শীতের রাত। এর মধ্যে চারিদিক যেন নিঃসাড় হয়ে এসেছে। হোটেলে কেউ জেগে আছে বলে মনে হয় না।

১৫ নম্বর ঘর।

ম্যানেজার শঙ্করপ্রসাদ চললেন আমাদের ঘর দেখিয়ে দিতে।

আমি, কিরীটি আর ইউনিফর্ম-পরা শিউশরণ। শিউশরণের নির্দেশে ম্যানেজার বন্ধ ঘরের দরজার গায়ে এগিয়ে গিয়ে নক্ করলেন।

ভিতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন এলো, 'কে?'

'আমি ম্যানেজার। দরজাটা খুলুন একবার। দরকার আছে।'

'দাঁড়ান। খুলছি

মিনিট খানেক বাদেই দরজা খুলতেই একটা দমকা ঝোড়ো হাওয়ার মতই হুড়মুড় করে প্রথমে শিউশরণ, তার পিছনে কিরীটি আর আমি ম্যানেজার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। শিউশরণের হাতে উদ্যত পিস্তল। ঘটনাটা এমন চকিতে ঘটলো যে ঘরের মধ্যে সাধন সরকার আর মুসলমান ভদ্রলোকটি হকচকিয়ে যায়।

মুসলমান ভদ্রলোকটির হাতে একটা কালো রংয়ের চামড়ার ব্যাগ। গায়ে একটা লাল রংয়ের আলোয়ান এবং চোখে কালো রংয়ের চশমা।

'এ সবের মানে কি ইন্‌স্পেকটর ?—' রুক্ষ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন সাধন সরকার।

জবাব দিল কিরীটি—'স্যর ভূপেন্দ্র সরকারকে খুন করার অপরাধে আপনাকে আর আপনার ঐ চশমাধারী বন্ধুটিকে গ্রেফতার করতে উনি এসেছেন মিঃ সরকার।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, চশমাধারী দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি ব্যাগ হাতে ঘর থেকে সরে পড়বার মতলব করছেন তখন। কিন্তু সেটা কিরীটির নজর এড়ায়নি। তার দিকে তাকিয়ে কিরীটি বলে, 'বৃথা চেষ্টা। লাভ হবে না কিছু! তোমাকে হাতে-নাতে ধরবো বলেই সাধনবাবুকে ছেড়ে দিয়ে এই ফাঁদ পেতেছিলেন—মিঞা-সাব্! এলাহাবাদে স্টেশনে গাড়ি থামবার আগে জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে আমি তাকিয়ে ছিলাম। গাড়ি থেকে তোমাকে আমি নামতে দেখেছি। শুধু তাই নয়, মাঝ পথে এলার্ম-চেন টেনে গাড়ি থামাবার পর স্যর ভূপেন্দ্রনাথের দেহের সামনে ভিড়ের মধ্যেও তোমাকে দেখেছি। সেখানে তোমার সম্পর্কে কিছু মনে হয়নি। কিন্তু মারাত্মক ভুল তুমি করেছো—স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে দ্বিতীয়বার আমার সামনে এসে ইন্‌স্পেকটরের সঙ্গে দম্ভভরে কথা বলতে গিয়ে।'

কিরীটি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে—

'চিনতে পারছো না এ মহাত্মাকে শিউশরণ? I am sure he is your old friend বন্‌শীলাল।'

'বন্‌শীলাল!' কোনোমতে শিউশরণ কথাটা উচ্চারণ করে।

'হ্যাঁ। দাড়ি আর চশমা খুলে ফেললেই খোলশ-ছাড়া সাপকে চিনবে! চশমা আর দাড়ি ওর নির্মোক মাত্র।'

তারপর একটু থেমে কিরীটি বলে, 'সাধন সরকারের নিশ্চয় গোপনে আফিঙের ব্যবসা ছিল এদের সঙ্গে, আর এ সব ব্যাপারের জানাজানি হয়ে গেল যা, হয়—এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল নিশ্চই!'

সত্যই তাই।

ভূপেন্দ্র সরকারকে খুন করেছে বন্‌শীলালই সাধন সরকারের সাহায্যে। ভাইপো ও কাকার টিকিট এলাহাবাদ পর্যন্তই ছিল। ঐ চোরাই আফিমের ব্যবসা নিয়েই কাকা ও ভাইপোতে সুরু হয় গোলযোগ। তখন সে ফন্দি করে বনশীলালের পরামর্শমত মস্তিষ্কের ব্যাধির দোহাই দিয়ে কাকাকে দিল্লী থেকে সরিয়ে আনছিল। পরিকল্পনা ছিল পথেই কাজ হাসিল করা। এবং হলোও তাই।

তদন্তে প্রকাশ পায়, তীব্র বিষে সরকারের মৃত্যু। পরে মৃতদেহটা চলন্ত ট্রেণ থেকে ফেলে দেওয়া হয়—দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলে ব্যাপারটা সাজাবার মতলবে।

পরের দিন কিরীটি আর আমি কলকাতায় ফিরছি। কিরীটি বলছিল—'সাধন সরকারকে ছেড়ে না দিলে এত সহজে

ব্যাপারটার মীমাংসা হতো না। ব্রেকভ্যানে বে-আইনী আফিম পুলিশ পায়নি, তার কারণ—সে মালটা ছিল সাধন সরকারের নিজের কাছেই। এ সন্দেহ কেন হলো জানো? বাবুলের কথায়। রিজার্ভ করা কুপে—বাইরের লোক এসে উঠে কি করে যা আমার নজরে পড়েছিল?

আমি বললাম—'ঠিক বলেছো—এদিক দিয়ে আমরা জিনিষটা মোটে চিন্তা করে দেখিনি।'

'একটু ভালো করে ভাবলে তোমরাও দেখতে পেতে।' কিরীটি বললো,—'আর একটা জিনিষ জানো?'

বললাম, 'কি?—'

'স্তর ভূপেনকে মৃত অবস্থায় চিং করে ফেলে দিয়েছিল—সেজন্য তাঁর মাথার খুলির পিছনটা থেঁতলানো,—ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে মানুষ সামনের দিকেই লাফ দেয়। সে ক্ষেত্রে নাক মুখ চোখ—এ-সবে প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন থাকতো—কিন্তু এতে সে সব কিছু ছিল না,—হাতে যে এ্যাড্‌হিসিভ্‌ প্লাষ্টার দেখেছো, খুব সম্ভব ঐ পথেই বিষ প্রয়োগ করেছে।'

'তার আগে বাবুলের দুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। কেমন ঠিক তো?' বললাম আমি।

কিরীটি বললে, 'ঠিক বলেছো!'

'ব্যাপার আর একটা কি, জানো?' কিরীটি আবার—

বলতে থাকে, 'ভূপেন সরকারের রিস্ট-ওয়াচের মেটাল-ব্যাণ্ডটাতে লাল আলোয়ানের একটু পশম আটকে ছিল। কাজেই

বাবুলের দেখা সেই স্ত্রীলোকটিকেও এর মধ্যে পাওয়া যায়। পাপ কখনো চাপা থাকেনি, কোনো দিন তা থাক্‌বে না। আশ্চর্য, তবু মানুষ উগ্র লোভে চুরি-বাটপাড়ি খুন করতে ছাড়ে না। তাদের ধারণা, তাদের চেয়ে বুদ্ধিমান পৃথিবীতে বুঝি আর কেউ নেই!'

কিরীটি চুপ করলো।

নিস্তব্ধ শীত-রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে আমাদের কলকাতা-গামী মেল ট্রেণটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ছে তখন।

গাড়ির দুলুনিতে আমার চোখের পাতায় ঘুম জড়িয়ে আসে। বোধ হয়, ওরও এমনি ঘুম পেয়ে থাক্‌বে!

॥ ৩ ॥

কিরীটির বাড়ীর বৈঠকখানায় সব জানালা দরজাগুলো এঁটে ঘর অন্ধকার করে কিরীটির বক্তৃতা শুনছিলাম।

বিষয়টাও অত্যন্ত নীরস: কেমন করে কলমের সাহায্যে বড় জাতের বেলফুল ফোটান যায়। কি কি দিয়ে মাটিতে সার দিতে হবে। এবং দুষ্প্রাপ্য সব বস্তুরই নাম করছিল সে। এমনি সময় আকাশ ভেঙ্গে মুষল ধারায় নামলো প্রবল বৃষ্টি। ঝম্ ঝম্ ঝম্! প্রবল বর্ষণের শব্দ সত্যিই সমস্ত দেহ মনে একটা পরি-তৃপ্তির স্নিগ্ধতা এনে দিল। কিরীটি চেয়ারটা ছেড়ে উঠে এক এক করে ঘরের জানালার কবাটগুলো খুলে দিতে লাগল। তারপর খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে কি যেন লক্ষ্য করে সে বললে, 'সদরে একটা মস্ত বড় গাড়ী এসে দাঁড়াল সু! হাঁ, এই অধমের কুটীরেই আগন্তুক! ঐ যে কলিং বেল টিপছেন। যা, নিচে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আয়। এই বাদলায় জংগলীর নাক ডাকা থামাব না।'

অগত্যা আর কি করি, উঠ্‌তেই হলো।

নিচে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলাম তখনও মধ্যে মধ্যে কলিং বেলটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে চলেছে।

দরজাটা খুলে দিতেই মধ্যবয়েসী মোটাসোটা একটি ভদ্র-

লোক একরকম আমাকে ঠেলেই যেন কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

'উঃ কি বৃষ্টি, এক মিনিটে ভিজিয়ে দিলে মশাই!—'

ভদ্রলোক তাঁর পরিধানের দামী মিহি শান্তিপুরে ধুতির সিক্ত অংশগুলো ও জলসিক্ত মিহি আদ্দির পাঞ্জাবাটা দু'হাতে ধরে ঝাড়ছেন।

পায়ের বাঘের চামড়ার নিউকাট জুতোটাও জলে ভিজে গিয়েছে একেবারে সপ্ সপে হ'য়ে।

আমি একদৃষ্টে আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম: এই পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়েস হবে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। মুখখানা গোলগাল, নাকটা থ্যাবড়া, চোখদুটো ছোট ছোট। ছোট কপাল। চোখে রিম্‌লেশ চশমা। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা।

সব কিছু জড়িয়ে অর্থ ও আভিজাত্যের একটা সুস্পষ্ট ইংগিত যেন।

ভদ্রলোক আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনিই বোধ হয় মিঃ কিরীটি রায়?—'

মৃদু হেসে জবাব দিলাম, 'আজ্ঞে রায় বটে, তবে কিরীটি নই, সুব্রত রায়।—'

'ওঃ নমস্কার। তা কিরীটি বাবুর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম। তিনি—'

'চলুন সে উপরেই আছে!'

'ওঃ—'

আমি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। আগন্তুক আমাকে অনুসরণ করলেন।

বৃষ্টির জলের ছাঁট আর ঠাণ্ডা জলো হাওয়ার ঝাপটা তখনও সমান ভাবে এসে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। ঘরের মেঝেটা ইতিমধ্যেই বৃষ্টির জলে যেন থৈ থৈ করছে একেবারে।

জলকণাবাহী ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটাও হু হু করে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছে।

আকাশের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোও যেন প্রায় লুপ্ত হয়েছে। সমস্ত ঘর জুড়ে একটা থম্‌থমে আবছা অন্ধকার।

সব কিছুর সঙ্গে কিরীটিও যেন কেমন অস্পষ্ট আবছা হ'য়ে সোফার উপরে নির্বিকারে বসে আছে।

আমাদের পদশব্দেও সে কোন সাড়া দিল না দেখে গলা-খাকড়ী দিয়ে ডাকলাম, 'কিরীটি, এই ভদ্রলোক তোর সঙ্গে দেখা করতে চান—'

'কে! ও, আরে ওঁকে এঘরে আনলি কেন? পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা! আসছি আমি।—'

ভদ্রলোকও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কেমন যেন একটু থম্‌কেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমি যখন তাঁকে পাশের ঘরে যাবার জন্য আহ্বান করলাম, তাঁর মুখ দেখে মনে হলো তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

পাশের ঘরে এসে সুইচ্‌ টিপে আলো জ্বেলে ভদ্রলোককে বসতে বললাম।

ভদ্রলোক বসলেন বটে, তবে তাঁর মুখে যেন একটা সুস্পষ্ট হতাশার চিহ্ন।

বোধ হয় ত' নাম শুনে এতদূর এসে শেষকালে কিরীটিকে দেখে বেশ একটু হতাশই হয়েছেন।

মনে মনে না হেসে পারলাম না। আহা, বেচারী!

একটু পরেই কিরীটি এসে ঘরে প্রবেশ করল।

যে অবস্থায় ছিল সে, ঠিক সেই অবস্থাতেই এসেছে।

পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও খদ্দরের পাঞ্জাবী! মুখে একটা জ্বলন্ত চুরোট।

আগন্তুক ভদ্রলোক নিজেই তাঁর পরিচয় দিলেন, 'আমার নাম ভুবনেশ্বর সিংহ। রায়বাহাদুর সর্বেশ্বর সিংহের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, মস্ত বড় মার্চেণ্ট! লেজিস্‌লেটিভ্‌ এ্যাসেম্বলীর মেম্বর ছিলেন। বোর্ড অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট!—'

কিরীটি একগাল ধোঁয়া টেনে নিয়ে তারই রিং একটার পর একটা ছাড়তে ছাড়তে মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আপনি বুঝি তাঁরই—'

'আজ্ঞে হাঁ, ছেলে, একমাত্র ওয়ারিশান।—'

'ওঃ, তাহলে কে আবার দ্বিতীয় ওয়ারিশান এসে দাঁড়ালেন! লোকে যখন জানে আপনিই একমাত্র—'

কিরীটির কথা শুনে বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে তাকালেন ভুবনেশ্বর সিংহ কিরীটির মুখের দিকে। ক্ষণপূর্বের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে এখন যেন গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছে।

'কিন্তু আপনি কি করে জানলেন মিঃ রায় যে বাবার সম্পত্তির একজন দ্বিতীয় ওয়ারিশান এসে উপস্থিত হয়েছেন ?—'

'Nothing but common sense—নচেৎ সর্বেশ্বর সিংহের একমাত্র ওয়ারিশান আমার মত লোকের দ্বারস্থ হবেন কেন এই বাদলা মাথায় করে ? কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুনত। এ সব ব্যাপার আইন-আদালতই ত ঠিক করে দেবে—'

'নাঃ মিঃ রায়, ঠিক তা নয়। ব্যাপারটার মধ্যে আরো একটু ঘোরপ্যাঁচ আছে !—'

'কি রকম ?—'

'বাবার আসল উইলটা আজ দিন পাঁচেক আমার ঘরের আয়রণ চেষ্ট থেকে চুরি গিয়েছে। আর তার পরিবর্তে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে একটা জাল উইল।—'

'তাহলেই বা আমি কি করতে পারি বলুন মিঃ সিংহ !—'

'আপনার নাম শুনে এবং বিশেষ করে আমার এক বন্ধুর কথায় আপনার কাছে আমি ছুটে এসেছি। অপর পক্ষ শাসাচ্ছে যে, সম্পত্তি সমান ভাগ করে দিতে হবে। নচেৎ সে হাইকোর্টে মামলা করবে। এখন মামলা করতে গেলে বাবার সত্যিকারের উইলের বদলে আমাকে ঐ জাল উইলই-একজিবিটে দেখাতে

হয়। তাহলে দোষী ত আমি আইনে সাব্যস্ত হবোই—সম্পত্তির অর্ধেকও যাবে। কিরীটি বাবু, আমাকে এই বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে।—'

কাতর কাকুতি ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে ঝড়ে পড়ল।

'মাপ করবেন সিংহ মশাই, আমার হাতে এখন সময় একেবারেই কম।—'

'তবে কি হবে কিরীটি বাবু? আমি কি তা'হলে ধনে প্রাণে মারা যাবো? উঃ কি সাংঘাতিক। বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি—তার অর্ধেক মানে দশ লক্ষ টাকা। না, না! আমি তা'হলে সত্যিই মরে যাবো! কিরীটি বাবু আমাকে বাঁচান। আপনার পারিশ্রমিক যা লাগে আমি দেবো।—'

'পুলিশে সব খুলে জানান না। তারা হয়ত একটা পথ বাৎলে দিতে পারে। তা'ছাড়া আইন ত' আছে, এবং আপনার বাবায় উইলের copyও ত আপনাদের আইন-উপদেষ্টা সলিসিটারের কাছে আছে।'

'দুঃখের কথা আর বলবেন না কিরীটি বাবু। ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার সলিসিটার রাঘব মিত্তির। আর তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমার বাল্যবন্ধু অনন্ত বিশ্বাস এড্‌ভোকেট।'

'বলেন কি সিংহ মশাই? আপনার সলিসিটার? আপনার উকিল?—'

'আর বলি কি!—অপরপক্ষ ওদের টাকা দিয়ে বোধ হয়

হাত করেছে। সলিসিটার আমায় বলেছে প্রয়োজন হলে সে সেই উইল একেবারে হাইকোর্টেই দাখিল করবে।—'

কিরীটি এবারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সুব্রত, পার ত ভদ্রলোককে সাহায্য কর না!'

'আমি!—' সবিস্ময়ে কিরীটির মুখের দিকে তাকালাম।

'হাঁ, এমন কিছু কঠিন নয়। যে এডভোকেট্‌ আইনকে জীবিকা ব'লে গ্রহণ করে এই ধরণের বে-আইনী কাজ অর্থের লোভে করতে পারে, তার যত বুদ্ধিই থাক সেটা দুর্বুদ্ধি। সে দুর্বুদ্ধি তুই ঘায়েল করতে পারবি না?—'

'কিন্তু কিরীটি বাবু, অনেক আশা করে আপনার কাছে এসেছিলাম!—'

'ভয় নেই আপনার সিংহ মশাই। আপনার এ বিপদ থেকে সুব্রতই আপনাকে উদ্ধার করে দিতে পারবে।' বলে কিরীটি সিগারের অগ্রভাগটা এ্যাস্‌ট্রের গায়ে ঠুকে ঠুকে ছাইটা ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

খ

অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করেও কিরীটিকে রাজী না করাতে পেরে ভুবনেশ্বর শেষ পর্য্যন্ত কিরীটির প্রস্তাবেই রাজী হলেন। তারপর বলতে স্বরু করলেন তাঁর কাহিনী।

সর্বেশ্বর সিংহ গত হয়েছেন মাত্র মাস দেড়েক হবে।

ভুবনেশ্বর সিংহই তাঁর একমাত্র পুত্র। ভুবনেশ্বর প্রথম বয়সেই বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু একটি কন্যার জন্ম দিয়েই বছর বারো হলো তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সংসারে তাঁর আপনার বলতে একটিমাত্র কন্যা অমলা—বারো পেরিয়ে সবে সে তেরোয় পড়েছে। ভুবনেশ্বর আর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন নি।

প্রকাণ্ড লোহার ব্যবসা ও তেজারতি কারবারে সিংহরা দুই পুরুষ ধরে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছেন।

কলকাতা সহরে খান-সাতেক বড় বড় বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে।

বেহালা অঞ্চলে যে পৈতৃক বাড়ীটায় সিংহরা বসবাস করেন সেটাও প্রাসাদতুল্য।

সর্বেশ্বর সিংহ পিতা তারকেশ্বরের কাছ থেকে যে বিষয়-সম্পত্তি পেয়েছিলেন, নিজের চেষ্টায় তাকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে তোলেন। ভুবনেশ্বরও পিতার মতই সঞ্চয়ী ও হিসাবী ছিলেন, কাজেই সম্পত্তির আয় বৃদ্ধির পথেই চলেছে।

সর্বেশ্বরের সম্পত্তির দ্বিতীয় ওয়ারিশন হ'য়ে রঙ্গমঞ্চে এসে দেখা দিয়েছেন কালীনাথ চৌধুরী।

কালীনাথ চৌধুরী সর্বেশ্বরের একমাত্র কন্যা, ভুবনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা নিস্তারিণী দেবীর একমাত্র পুত্র। নিস্তারিণী এখন বেঁচে নেই।

কালীনাথ বলছেন—তাঁর দাদামশাই সর্বেশ্বর সিংহ নাকি তাঁর

যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর একমাত্র কন্যা নিস্তারিণীকে ও পুত্র ভুবনেশ্বরকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন।

নিস্তারিণী ও ভুবনেশ্বর দীর্ঘ আঠার বছরের ছোট বড়।

একমাত্র কন্যা নিস্তারিণীর বিবাহ সর্বেশ্বর বহু অর্থ ব্যয় করে জাঁকজমকের সঙ্গেই দিয়েছিলেন। তারপর নিস্তারিণীর স্বামীকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দীর্ঘ দশ বছর ধরে বহুভাবে সাহায্যও করেছেন কিন্তু নিস্তারিণীর স্বামী হরবিলাস ঘোড়দৌড়ের মাঠে যথাসর্বস্ব খুইয়ে শেষ পর্যন্ত এক খুনের মামলায় পড়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হন। তারপর নিস্তারিণী আত্মহত্যা করে সব দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।

তাদেরই একমাত্র ছেলে ঐ কালীনাথ।

হরবিলাসের যোগ্য পুত্রই কালীনাথ। গোড়া থেকেই সে বাপের জীবনের পথটাকেই বেছে নিয়ে অধঃপতনের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছিল।

সর্বেশ্বর কালীনাথকে প্রথম প্রথম শোধরাবার চেষ্টা করে-ছিলেন কিন্তু কোন ফল হয়নি।

মৃত্যুর দুই বৎসর আগে পর্যন্তও কালীনাথকে অর্থসাহায্য করেছেন নিয়মিত। তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেন।

নিস্তারিণীর অবর্তমানে তাঁর একমাত্র পুত্র কালীনাথ আজ মৃত সর্বেশ্বরের অর্ধেক সম্পত্তির দাবী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার উকিলের ও সলিসিটারের চিঠিতে সে জানিয়েছে মৃত সর্বেশ্বর রায়ের উইল অনুসারেই নাকি সে ঐ দাবী জানাচ্ছে।

দিন দশেক আগেও ভুবনেশ্বর তাঁর শোবার ঘরের আয়রণ সেফে পিতার আসল উইলটা দেখেছিলেন।

দিন পনের হলো কালীনাথ তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে এসে ভুবনেশ্বরের বাড়ীতেই ওঠে: ওঠবার সময় সে দানে প্রার্থীর মতই এসে উঠেছিল, ভুবনেশ্বরও বিশেষ আপত্তি করেননি। অত বড় বাড়ীটার মধ্যে নীচের তলায় যদি সে পড়েই থাকে ত থাক না। প্রথমতঃ নিচের তলাটা ত খালিই পড়ে থাকে, দ্বিতীয়তঃ সর্বেশ্বর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যে উইল করে যান সেই উইলে তাঁর আদরিণী দুহিতার একমাত্র পুত্রকে একেবারে বঞ্চিত করতে পারেননি। কালীনাথের স্ত্রী বনমালা ও তার পুত্র সুধীরকে নগদ দশ হাজার টাকা ও কলকাতার উপরে একখানা একতলা বাড়ী দান করে গিয়েছেন! অবশ্য সে টাকা ও বাড়ীর 'পরে কালীনাথের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। বিশেষ করে, দ্বিতীয় কারণটির জন্যই ভুবনেশ্বরের ভাগ্নে ও তার স্ত্রীপুত্রকে নিজ বাটীতে স্থান দিয়েছিলেন।

কিন্তু চার পাঁচ দিন নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে কাটানর পর একদিন প্রত্যুষে কালীনাথ ভুবনেশ্বরের কাছে গিয়ে একটা দোকান দেবার জন্য হাজার দুই টাকা চান।

ভুবনেশ্বর জবাব দেন, 'এখানে থাকতে হয় তুমি থাক, কালীনাথ। একটি পয়সাও তুমি পাবে না।'

'কেন ?—'

'কেন কি! প্রথমত নষ্ট করবার মত টাকা আমার

নেই, দ্বিতীয়ত থাকলেও আমি তোমায় একটি পয়সাও দেবো না।—'

'ভুবনেশ্বর বাবু! তুমি একটু ভুল করছো। প্রার্থী হিসাবে তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি না। আমার নেয্য প্রাপ্য টাকাই তোমার কাছে আমি দাবী করছি।—'

'নেয্য প্রাপ্য টাকা! কিসের?—'

'কেন, দাদুর সম্পত্তির অর্ধেকের অংশীদার ত আমি!—'

'এ মহামূল্য সংবাদটি তুমি কোথায় পেলে কালীনাথ?—'

'দাদুর উইল থেকে!—'

'সে উইল বুঝি তোমার হাতেই দাদু দিয়ে গিয়েছেন মরবার সময়?—'

'আমার হাতে দেবেন কেন? একটা copy তোমার আয়রণ সেফে আছে, আর একটা copy আছে তোমার এটর্ণীর অফিসে।—'

'বটে! তবে তুমিও শুনে রাখ কালীনাথ, আমার কাছে যে উইল আছে, সে উইলে তোমার কোন নামগন্ধই নেই। সামান্য যা আছে তা তোমার স্ত্রী ও পুত্র সুধীরের সম্বন্ধে, এবং তার উপরেও তোমার কোন ভোগ-দখল-স্বত্ব নেই।'

'আছে কি না আছে উইলটা খুলে একবার দেখলেই জানা যাবে। আর একটা কথাও আমি বলতে চাই। দাদু তাঁর উইল রেজিষ্টারী করবার সময় বা সুযোগ পাননি। সেটা রেজেষ্ট্রীও যতশীঘ্র সম্ভব করে ফেলতে হবে।—'

আমি এইখানে বাধা দিলাম, 'আপনার বাবার উইল কি রেজেষ্টারী হয়নি ?—'

'না,—' ভুবনেশ্বর জবাব দিলেন, 'মরবার মাত্র দশদিন আগে বাবা তার উইল করে যান। নানা গোলমালে তখন উইল রেজিষ্টারী করা হয়নি।—'

'হুঁ। তারপর ?....'

ভুবনেশ্বর আবার সুরু করলেন, 'আমি কালীনাথের কথায় ভয়ানক রেগে গেলাম, এবং তাকে বাড়ী থেকে দূর করে দেবো এ ভয়ও দেখালাম। কালীনাথ তাতে জবাব দিল, ক্ষমতা থাকে ত' তাকে যেন আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই। উইলের সর্ত অনুযায়ী সব ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সে পাদমেকং ন গচ্ছামি। একটা ব্যাপারে কিন্তু সত্যিই একটু খটকা লাগলো। কালীনাথের কথার মধ্যে বরাবরই যেন একটা দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে কালীনাথ কথাগুলো বলছিল কি করে? আমার নিজের মনের মধ্যেও কোথায় যেন একটা সন্দেহের কাঁটা খচ্ খচ্ করছিল, সোজা উপরের ঘরে গিয়ে তখুনি আয়রণ সেফটা খুলে বাবার উইলটা বার করলাম। কিন্তু সেটা দেখে চোখ আমার বিস্ময়ে আতঙ্কে একেবারে কপালে উঠে গেল। সর্বনাশ! এ কোন উইল! বাবার আসল ও সত্যিকারের উইলটা গেল কোথায় ? মাথা আমার বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠলো! উইলের নিচে স্বাক্ষরও অবিকল বাবারই। দুইজন সাক্ষী—সলিসিটার রাঘব মিত্র ও আমাদের এডভোকেট অনন্ত বিশ্বাস, তাদেরও সই রয়েছে।

এবং সেই উইল অনুযায়ী কালীনাথ সত্যি সত্যিই বাবার সুবিপুল সম্পত্তির অর্ধেকের অংশীদার। কি করি উপায়! ঘণ্টাখানেক স্থাণুর মতই সেখানে উইলটা হাতে বসে রইলাম। এ কি মহা সঙ্কট! সেই দিনই তক্ষুনি গাড়ীতে ছুটে গেলাম সলিসিটার রাঘব মিত্রের ওখানে। রাঘব ত' প্রথমটায় আমার সঙ্গে দেখাই করবে না। পরে যখন দেখা করল, বললে তার কাছে যে উইলের copy আছে তা সে দেখাতে রাজী নয়—দেখাতে যদি একান্তই হয়—দেখাবে সে উইলের অন্য অংশীদারের উপস্থিতি-তেই। আমি ত স্তম্ভিত! পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে! আমি জেগে না ঘুমিয়ে? রাঘব মিত্র এসব কি বলছে? ছুটলাম এরপর অনন্ত বিশ্বাসের কাছে, সেখানেও সেই একই জবাব। বুঝলাম একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র আমার চারপাশে মাকড়সার জালের মত ঘিরে উঠেছে! আমি ঘুণাক্ষরে তা টেরও পাইনি। কি করি! কোথায় যাই! কে আমাকে এই মহা সঙ্কটে পরামর্শ দেবে! সাহায্য করবে!

টলতে টলতে গাড়ীতে এসে উঠে বসলাম। ফিরে এলাম বাড়ীতে, কিন্তু আমি যেন আর আমার মধ্যে নেই। ঠাকুর ডাকতে এলো খেতে যাবার জন্য, তাড়িয়ে দিলাম তাকে! ঘরে খিল এঁটে সারাটা দুপুর ও রাত ঘরের মধ্যে পাগলের মতই পায়চারি করে বেড়ালাম। আমার মেয়ে চার-পাঁচবার ডাকতে এসে কোন জবাব না পেয়ে ফিরে গেল। পরের দিন ভোরবেলা আমার একমাত্র বন্ধু শচীনের কাছে গেলাম। শচীন সব শুনে

আমায় পরামর্শ দিল, কালীনাথ যে দুই হাজার টাকা চেয়েছে সেটা তাকে দিতে এবং বর্তমানে তার সঙ্গে কোন গোলমাল না করতে।'

'টাকা দিয়েছেন কালীনাথকে ?—' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হাঁ। এবং শচীনের পরামর্শেই কিরীটি বাবুর শরণাপন্ন হয়েছি।—'

'কালীনাথ তা'হলে আপনার বাড়ীতেই আছে এখনও !—'

'হাঁ! গতকালও তাকে আরো এক হাজার টাকা দিতে হয়েছে !—'

কিরীটি এতক্ষণ চুপচাপ ভুবনেশ্বরের কথা শুনছিল। এবারে মৃদু হেসে বললে, 'বুদ্ধিমান একেবারে আটঘাট বেঁধেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে বটে, তবে মারাত্মক ভুল দুটো সে করেছে !—'

আমি ও ভুবনেশ্বর দুজনেই যুগপৎ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটির ওষ্ঠপ্রান্তে অদ্ভুত একটুখানি হাসি, 'হাঁ! প্রথমত সে একবারও ভাবেনি—black mailing যা এখন সিংহ মশাইকে করছে, সেটা বর্তমানে successful হলেও একদিন তার বিরুদ্ধে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত সে ভাবেনি যে, একে গোপনতা, দুইয়ে ফিস্ ফিস্, তিনে হাট। তারপর ভুবনেশ্বর বাবুর দিকে তাকিয়ে কিরীটি বললে, 'ভয় নেই, সিংহ মশাই! উইল জাল করতে গিয়ে নিজেই মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছে কালীনাথ। সেই জাল দিয়েই তাকে সুব্রত ডাঙ্গায় তুলতে পারবে।—'

'পারবেন ? আপনি বলছেন উনি তা পারবেন ?—' ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন ভুবনেশ্বর।

'নিশ্চয়ই! কিরীটির অভিধানে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই।—'

আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটি বললে, 'সুব্রত, কাল তুই একবার যাবি সিংহ মশাইয়ের বাড়ীতে। যেমন করে হোক কালীনাথ প্রভুর সঙ্গে আলাপ করে চেনা-পরিচয়টা করে আসবি।'

'কিন্তু কি ভাবে সেটা সম্ভব হবে ?—' প্রশ্ন করলাম আমি।

'একটা ছল করে।—'

'একটা ছল করে ?'

'হাঁ রে! তোর মত দুরাত্মার কি ছলের অভাব হবে ?—হাঁ। দুরাত্মার সঙ্গে আলাপ জমাতে হলে দুরাত্মা হয়েই যেতে হবে। যস্মিন ক্ষেত্রে যদাচারঃ।'

গ

সারাটা রাত ভেবে ভেবে একটা উপায় ঠিক করলাম। ভুবনেশ্বরের বন্ধু সেজে ভুবনেশ্বরের সাহায্যে প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতটুকু করতে হবে। পরের দিন সকালে বেহালায় ভুবনেশ্বরের কুটীরে গিয়ে হাজির হলাম। ভুবনেশ্বর আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন। আমাকে সাদর আহ্বান জানালেন, 'আসুন সুব্রত বাবু!'

ভুবনেশ্বরকে বুঝিয়ে বললাম কি ভাবে তাঁর বন্ধু বলে কালীনাথের কাছে আমার পরিচয়টা দিতে হবে। তিনি সম্মত হলেন। বললেন, 'চলুন তাহলে নিচে তার ঘরে !—'

ভুবনেশ্বরের বাড়ীটা ত্রিতল।

একতলায় পাঁচখানি ঘর, বাইরের ঘরটি বাদ দিয়ে পাঁচখানা ঘর নিয়েই কালীনাথ তার বর্তমান সংসারটি বেশ কায়েমা করেই পেতে বসেছে।

বাইরের ঘরটির পাশের ঘরখানিই কালীনাথ তার বহির্বাটি করে নিয়েছে।

পর্দা তুলে আগে ভুবনেশ্বর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তারপর ডাকলেন আমাকে—'ঘরে এসো পরিমল, কালীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই !—'

আমি ভুবনেশ্বরের আহ্বানে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘরের এককোণে ঐ দিনকার সংবাদপত্রটা কোলের উপরে মেলে একটা আরাম কেদারার উপরে কালীনাথ বসে ছিল। ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের জন্য আমাদের পরস্পরের চোখাচোখি হলো।

মানুষের চোখে অমন ধারালো অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ইতিপূর্বে বড় একটা আমি দেখিনি।

সে চোখের দৃষ্টির মধ্যে একসঙ্গে যেন তিনটি জিনিষের সন্ধান পেলাম—সাপের খলতা, নেকড়ের ক্ষুধা ও শৃগালের চাতুরী।

লোকটা চেহারা শুক্নো পাকানো দড়ির মত। দেহের

কোন পেশীতে কোথাও যেন এতটুকু রস নেই। আর মুখটা শেয়ালের মত ছুঁচালো। সেই ছুঁচালো মুখের হনূ দুটো বিশ্রী-ভাবে সজাগ হয়ে আছে। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল তৈলনিষিক্ত। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

সমস্ত চেহারার মধ্যে কোথায়ও একটুকু মাধুর্য বা আভিজাত্য নেই এবং চেহারার সঙ্গে বেশভূষার একটা চক্ষুপীড়াদায়ক অসামঞ্জস্য। পরিধানে দামী ফরাসডাঙ্গার মিহি কালাপাড় ধুতি ও গায়ে সূক্ষ্ম দামী বিলাতী নেটের গেঞ্জী।

কালীনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বারেকের জন্য আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ভুবনেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভুবনেশ্বর বাবু, ভদ্রলোক তোমার বন্ধু?—তা বেশ, বসুন স্যার! ভুবনেশ্বরের বন্ধু আপনি, তা'হলে আমারও বন্ধু হলেন, কি বলেন—য়্যাঁ!' বলতে বলতে কালীনাথ আকর্ণবিস্তৃত একটা হাঁ করে হাসতে লাগল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে কালীনাথের কালো দু'পাটি দাঁত বিকসিত হলো।

মানুষ এত কুৎসিত হাসতে পারে বা কারো হাসি এত কুৎসিত হতে পারে পূর্বে আমার জানা ছিল না। বুঝতে কষ্ট হলো না কালীনাথ গভীর জলের কাত্‌লা।

'আরে বসুন স্যার! দাঁড়িয়েই রইলেন যে! ওরে বসন্ত, বাইরে তিন কাপ চা দিয়ে যা।—'

অগত্যা বসতেই হোল। ভাবছিলাম কিরীটি আমাকে এ কোন নরকে পাঠাল।

'ভুবনেশ্বর! তোমার এমন সব বন্ধুবান্ধব আছেন, এঁদের সকলকে একদিন একত্রে ডেকে তোমার বাবার উইলটা সর্বসমক্ষে পড়ে ফেলা যাক্ না! তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ একটা ভোজ। ভোজের খরচটা না হয় ভাগাভাগি করেই দেওয়া যাবে। তোমার বন্ধুরা ত' আমারও বন্ধু বটে। কি বলেন পরিমল বাবু, য়্যাঁ!—' আবার সেই আকর্ণবিস্তৃত হাঁ করে কুৎসিত হাসি। লোকটা শুধু ধূর্ত শয়তানই নয়, মহা পাপিষ্ঠ।

বসন্ত তিন কাপ চা নিয়ে এলো, কিন্তু চা-পানের প্রবৃত্তি তখন আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। পালাতে পারলে তখন আমি বাঁচি।

আরো মিনিট দশেক সেখানে বসে থেকে একবুক নিরাশা নিয়ে কিরীটির বাড়ীতে এলাম সোজা।

বেলা তখন বোধ হয় এগারটা হবে। কিরীটিকে ঘরের মধ্যে কোথায়ও দেখতে পেলাম না। কিরীটি ইদানীং ফুলের চাষের সঙ্গে সঙ্গে নানারকমের পাখী পুষছিল। দাঁড়ের উপর উপবিষ্ট একটা বহুবিচিত্র অষ্ট্রেলিয়ান কাকাতুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কলা খাওয়াচ্ছিল। আমার পদশব্দে ফিরে না তাকিয়েই বললে, 'কি হলো সু! সংবাদ কি?—'

'হলো না। সাক্ষাৎ শয়তান! আসল উইলটা যে বেটা নষ্ট করে ফেলেছে তা হলফ্ করে বলতে পারি!—'

'তা ফেলুক। কিন্তু আলাপ-পরিচয়টা কেমন হলো ?—' বলে পূর্ববৎ কাকাতুয়াটাকে কলা খাওয়াতে লাগল এক মনে।

কালীনাথ-সংবাদ সমস্ত খুলে বললাম, 'এখন বুঝতে পারছিস ত !—'

'তা বুঝতে পারছি বৈকি Solutionও ত তোর হাতের মুঠোর মধ্যেই এসে গিয়েছে। Opportunity comes once! Don't lose this chance !—

'কি বলছিস্ পাগলের মত যা তা—'

'মধুরেণ সমাপয়েতের offerটাত কালীনাথই দিয়েছে—এবারে একটু ভেবে সমাপ্ত করে দে।'

'সমাপ্ত করে দেবো ?—'

'হঁা। কালকে ভুবনেশ্বরের মুখে ব্যাপারটা শুনে একটু যা গোলমাল ছিল, এখন আর তাও নেই। Line of action I have already chalked out। ভুবনেশ্বরের বন্ধুবান্ধবদের ত' বলতেই হবে—সলিসিটার ও এডভোকেট মহাপ্রভুদেরও বলতে হবে। জানাতে হবে আমন্ত্রণ।—'

'তারপর ?—'

'তারপর আর কি, আসল উইল খানি উদ্ধার !—'

'দেখ কিরীটি, আসল ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবি হেঁয়ালী ছেড়ে ?—'

'হেঁয়ালীই এর মধ্যে কোথায়ও এতটুকু নেই, তার ছাড়বো

কি? যা ভুবনেশ্বরের সঙ্গে দেখা করে শীঘ্র একটা দিন ঠিক করে ফেল উইলটা পড়বার জন্য!—'

কিরীটিকে ত' আমি চিনি! নিশ্চয়ই সে ইতিমধ্যে solutionএ কিছু একটা পৌঁচেছে এবং যা করতে চায় সে এ ব্যাপারে, তার খসড়া সে মনে মনে স্থিরও করে ফেলেছে।

কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে কিছুই ত' বুঝবার উপায় নেই। কাকাতুয়াকে ছেড়ে তখন সে পাহাড়ী ময়না নিয়ে পড়েছে। গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে তখন পাহাড়ী ময়নার কণ্ঠে বোল ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত: পড় ময়না—চিচিং ফাঁক।

ঘ

কিরীটি নির্বিকার, কিন্তু দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না আমার। জানি হাজার প্রশ্ন করলেও কিরীটির কাছ থেকে কোন জবাব পাবো না, যতক্ষণ না সময় আসে রহস্যকে উদঘাটন করে বলবার।

আট দিন পরে রবিবারে ভুবনেশ্বরের বাড়ীতে সর্বসমক্ষে উইল পড়বার দিন ধার্য হয়েছে। ধার্য দিন যত এগিয়ে আসছে ভুবনেশ্বরের মুখখানা দুশ্চিন্তায় ততই যেন কালো হ'য়ে উঠছে।

আর মাত্র তিন দিন আছে ধার্য রবিবারের।

সকালবেলা ঘরে বসে সংবাদপত্র পড়ছি, ভুবনেশ্বর বাবু এসে হাজির, শুষ্ক মুখ, কোটরগত চক্ষু।

'শেষ পর্যন্ত আমার ভরাডুবি হবে না ত সুব্রত বাবু!—' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কথা কয়টি বলে থপ্‌ করে একটা সোফার উপরে বসে পড়লেন ভুবনেশ্বর।

'কিরীটি যখন আশ্বাস দিয়েছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ভুবনেশ্বর বাবু!—'

'কিন্তু সুব্রত বাবু, কিরীটি বাবুর কথা শুনে ঐ জাল উইলই সকলের সামনে একবার শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললে আর যে বাঁচবার কোন উপায়ই থাকবে না! হারামজাদা কালীনাথকে আপনারারা ত চেনেন না, তার খপ্পরে একবার পড়লে, সে আর আমাকে রেহাই দেবে না!—'

'আপনি নির্ভাবনায় থাকুন মিঃ সিংহ! আমি কিরীটিকে চিনি। He can do miracles!' তবু আশ্বাস দেবার চেষ্টা করি।

'আর নিশ্চিন্ত! রবিবার একেবারেই নিশ্চিন্ত হবো সুব্রত বাবু! উঃ! দশ লাখ টাকা!—'

লোকটা ত' ভারী অর্থপিশাচ! কেমন একটা ঘৃণা অনুভব করতে লাগলাম ভুবনেশ্বরের প্রতি।

আরো কিছুক্ষণ প্যান প্যান করে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

কাগজটা নিয়ে আবার বসলাম। হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দ ও কিরীটির গলা শোনা গেল। আবৃত্তি করতে করতে কিরীটি উপরে উঠে আসছে:

সিংহ মশাই, সিংহ মশাই
মাংস যদি চাও,

রাজহংস খেতে দেবো—

হিংসা ভুলে যাও !

আবৃত্তি করতে করতেই কিরীটি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল, 'কিরে, ভূতের মত মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন ?—' বলতে বলতে একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফটো আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

ফটোটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, 'কার ফটো ?—'

'সেই ত সুধীজন বোঝে যেই জন। বলত কার ফটো ?—'

ফটোটা কোট-টাই পরা, মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি—একজন অপরিচিত ব্যক্তির হাফ্ বাস্ট। চিনতে পারলাম না। বললাম, 'কে চিনি না—'

জবাবে এবারে কিরীটি হেসে উঠলো, 'জানিতে যদি গো তুমি পাষাণে কি ব্যথা আছে, গোপন বাণীটা তারি তোমার পরশ যাচে। চিনতে পারছিস না কিন্তু চিনবি শিগ্গিরি ! ভাল করে দেখে রাখ। হাঁ, দেখ ভাল কথা, সিংহ মশাইকে ফোন করে জানবি —কালীনাথের মদ্যপানের প্রতি আকর্ষণটা বর্তমানে কেমন ?'

কিরীটির কথায় হেসে জবাব দিলাম, 'না জিজ্ঞাসা করেও বলতে পারি। আথিক সচ্ছলতা—'

'ব্যাস্ ! ব্যাস্ !—তবে সেদিন যেন ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা থাকে—সিংহ মশাইকে বলে দিবি।—'

'ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা! কিন্তু একমাত্র কালীনাথ ছাড়া ড্রিঙ্ক করবে কে ?—'

'কেন তুই, ভুবনেশ্বর, রাঘব মিত্র, বিশ্বাস মশাই, সকলে—'

'তার মানে ?—'

'যস্মিন ক্ষেত্রে যদাচারঃ !—' হাসতে হাসতে জবাব !

আর একদিন মাত্র বাকী।

সকালবেলা সবে প্রভাতী চায়ের কাপটায় একটা চুমুক দিয়েছি, ভুবনেশ্বর সিংহের প্রবেশ।

'উঃ সুব্রত বাবু, কাল সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। কাল থেকে কেবল ভাবছি কেন মরতে আপনাদের কথায় রাজী হতে গিয়েছিলাম।...দশ লাখ টাকা এমনি করে হাতছাড়া হয়ে যাবে—তাও পাবে কিনা একটা বদচরিত্র মাতাল বোম্বেটে। আর কায়দা করে জাল উইল দিয়ে এমনি করে আমাকে বোকা বানাল। উঃ, এর চাইতে তার সঙ্গে যদি একটা আপোষ ব্যবস্থাও করে নিতাম !—'

কেমন রাগ হলো, বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বললাম, 'তাই না হয় করুন গিয়ে !—'.

'তারও কি আর উপায় আছে মশাই, কাল সন্ধ্যার পর শালা রাঘব মিত্তির এসেছিল—'

'রাঘব মিত্তির এসেছিল ?—'

'হঁা, বেটা কি বলে গেল জানেন ?—'

'কি ?—'

'বললে সে তাহলে তার উইলের কপিটা নিয়ে আসবে। আমার এত তাড়াতাড়ি সুবুদ্ধি হয়েছে জেনে সন্তুষ্ট হয়েছে জানিয়ে গেল।—'

মনের মধ্যে ভুবনেশ্বরের কথা শুনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। সলিসিটার রাঘব মিত্তির লোকটার হঠাৎ ঐ ভাবে ভুবনেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবার কি এমন প্রয়োজন ছিল।

আমিও ভিতরে ভিতরে ভুবনেশ্বরের ব্যাপার নিয়ে কেমন যেন ক্লান্ত বোধ করছিলাম।

রবিবারটা পার হয়ে গেলে আমিও যেন বাঁচি।

হঠাৎ মনে পড়ল গতকাল সন্ধ্যায় ফোন করে কিরীটি আমাকে বলেছিল আমি যেন ভুবনেশ্বরকে জানিয়ে দিই যে রবিবার রাত্রে যে ঘরে উইল পড়া হবে সে ঘরে যেন কম শক্তির একটা বাল্‌ব লাগানো থাকে। এইটুকু কেবল বুঝেছিলাম—কোন বিশেষ কারণেই কিরীটি সেদিন রাত্রে ঘরের আলোটা একটু কম চায়। বললাম ভুবনেশ্বর বাবুকে কথাটা।

ভুবনেশ্বর বললেন, 'তাই হবে।—'

'কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করলেন রবিবার রাত্রে?—'

'যেমন কিরীটি বাবু বলেছেন—শচীনকে, আমার আর এক বন্ধু রামপদকে! আমার সলিসিটার রাঘব মিত্তির, এডভোকেট অনন্ত বিশ্বাস! আর থাকবেন আপনি ও কালীনাথ।—'

৬

রবিবার। রাত আটটা বাজতে এখনো মিনিট কুড়ি বাকী।

সন্ধ্যা সাতটা থেকে আমরা সকলে ঘরের মধ্যে জমায়েৎ হয়েছি, একমাত্র রাঘব মিত্তিরই যা এখনো এসে পৌঁছায় নি। কে ফোন করে জানিয়েছে তার আসতে রাত সাড়ে আটটা হবে। একটা বিশেষ জরুরী কাজে সে চেম্বারে আটকা পড়েছে। সে এলে পর উইল পড়া হবে।

কালীনাথকে যেন আজ বেশ একটু প্রফুল্লই মনে হচ্ছে।

কিরীটির পূর্ব নির্দেশ মত একটা বোতলে পাঞ্চ করা ছিল, তাই মধ্যে মধ্যে তাকে ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল, আর অন্যান্য সকলে আমরা মদ বলে স্রেফ্ সরবৎ পান করছিলাম।

সকলেই হাসি খুশী, কেবল এক ভুবনেশ্বর সিংহ ব্যতীত।

তাঁর মুখখানা যেন আষাঢ়ে মেঘের মত কালো হয়ে আছে।

উৎকণ্ঠা আজ আর আমার এতটুকুও ছিল না, কারণ আজ যাই হোক একটা হেস্তনেস্ত হ'য়ে যাবে।

বাড়ীর দোতলার একটি কক্ষে আমরা সকলে একত্রে মিলিত হয়েছি।

ঘরের মধ্যে কম শক্তির একটা ইলেক্ট্রিক বালব জ্বলছে, সেদিকে নজর দেওয়ার কথা অবশ্য একমাত্র কালীনাথেরই, কিন্তু মানসিক স্ফুর্তিতে তার আজ কোন দিকেই যেন খেয়াল নেই।

ভুবনেশ্বর ভোজ্য বস্তুরও প্রচুর আয়োজন করেছেন, চৌরঙ্গীর

একটা নামকরা হোটেলের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট করা হয়েছে, তাদেরই একজন মুসলমান বেয়ারা চারিদিক দেখাশোনা করছে, সরবৎ, আইসক্রিম যে যা চান কিছুরই অভাব নেই।

স্ফূর্তিতে কালীনাথ আজ আবার অনেকদিন পরে ভুবনেশ্বরকে নাম ধরে না ডেকে 'মামা' বলেই সম্বোধন করছেন।

'কি মামা! তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না? একটা অরেঞ্জ বা ভিম্‌টোও ত' খেতে পারো।—'

কালীনাথের কথায় ভুবনেশ্বর কোন জবাব দেন না।

'আরে খাও। খেয়ে নাও। already ত one foot in the grave! কবে আর খাবে!—'

কালীনাথের কথায় ঘরের সকলেই হেসে ওঠে।

এমন সময় সলিসিটার রাঘব মিত্তির এসে ঘরে প্রবেশ করল, 'একটু দেরী হয়ে গেল!'

ভদ্রলোকের গলাটা একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

'আরে এসো এসো মিত্তির সাহেব। গলায় কি হলো? তোমার জন্য আমরা হা পিত্যেশ করে বসে—' কথাটা বললে কালীনাথ।

'হাঁ। হঠাৎ কাল ঠাণ্ডা লেগে গলাটা ধরে গেছে!—' রাঘব মিত্তির জবাব দেয়।

'একটা dose খেয়ে নাও। দেখবে গলা একেবারে সাফ হয়ে গিয়েছে—' কালীনাথ হাস্য-তরল কণ্ঠে বলে ওঠে।

ঘরের সকলেও হেসে ওঠে।

'না ভাই, ওসব চলে না। এক কাপ চা হলে মন্দ হতো না।—'

ভুবনেশ্বরের আদেশে বেয়ারা রাঘব মিত্তিরকে এক কাপ গরম চা এনে দিল।

রাঘব মিত্তির লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে মনে হয়। মুখটা যেন চেনা চেনা। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।

অতঃপর কালীনাথেরই অনুরোধে সকলে উপবেশন করল। সর্বেশ্বরের উইলটা পড়া হবে। সলিসিটার রাঘব মিত্তিরই উইলটা পড়া শুরু করল ভুবনেশ্বরের হাত থেকে খামটা নিয়ে।

ভাঙ্গা কর্কশ গলায় রাঘব মিত্তির উইলটা পড়ে চলেছে: আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি—যাহার মূল্য ন্যূনাধিক প্রায় বিশ লক্ষ টাকা হইবে—তাহা আমি স্ব-ইচ্ছায় সজ্ঞানে নিম্নলিখিত ভাবে দান করিয়া যাইতেছি। সমস্ত সম্পত্তি সমান দুইটি ভাগে ভাগ হইবে। এক ভাগ পাইবে আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান ভুবনেশ্বর সিংহ এবং অন্য ভাগ (অর্ধেক) পাইবে আমার দৌহিত্র—আমার একমাত্র কন্যা নিস্তারিণী দেব্যার একমাত্র পুত্র শ্রীমান কালীনাথ—

সহসা এমন সময় দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বাধা দিলেন ভুবনেশ্বর। 'মিথ্যা কথা, এ উইল জাল।'

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হ'ল।

প্রথমটায় সকলেই বাক্যহারা স্তম্ভিত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

হঠাৎ কুৎসিত শব্দে হো হো করে হেসে উঠ্‌লো কালীনাথ, 'কি হলো মামা! হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! তুমিই ত উইল এনে দিলে।'

ভূবনেশ্বর কিন্তু কালীনাথের কথায় কান দিলেন না, রাঘব মিত্তিরের দিকে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, 'রাঘব বাবু! উইলটা রেজিষ্ট্রী হয়নি বটে, তবে একটা copy ত আপনার কাছেও আছে এবং উইলটা ত আপনারই লেখা। তাছাড়া এবারে আপনিই বলুন না এই কি আসল উইল?—'

'আসল না ত কি নকল? আসল বৈকি!—' বলে ওঠে রাঘব মিত্তির।

'না নকল!—' ভূবনেশ্বর বলে ওঠেন: ঐ কালীনাথের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আপনি একটা মিথ্যে উইল খাড়া করেছেন। এবং নিশ্চয়ই ওরই সাহায্যে আমার ঘরের আয়রণ সেফ্‌ থেকে আসল উইলটা চুরি করে ঐ নকল উইলটা আপনিই ষড়যন্ত্র করে সেখানে রেখে দিয়ে এসেছিলেন কোন এক সুযোগে!

'ব্রেভো ভুবনেশ্বর! ব্রেভো!—না! স্বীকার করতেই হলো তোমার ব্রেণ আছে বটে!—' ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বলে ওঠে কালীনাথ।

এবারে আমার পালা! আমি এগিয়ে কঠোরকণ্ঠে রাঘবের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'শুনুন মিত্তির সাহেব! This is a forged will!—

অনন্ত বিশ্বাসও চিৎকার করে ওঠে, 'কখনো না! আসল উইল।'

'মিঃ বিশ্বাস, থামুন! অত চেঁচিয়ে কোন লাভ হবে না। জানেন কত বড় অপরাধ আপনি ও মিঃ মিত্র ঐ শয়তান কালীনাথের সঙ্গে যোগসাজস করে করেছেন? জানেন এ অপরাধের দণ্ড কি? যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়—দলীল জাল করলে; তা' ছাড়া ভেবেছেন আসল উইলের কথা আর কেউ জানে না? কিন্তু ভুল! মৃত্যুর পূর্বে সর্বেশ্বর রায় এক বিশেষ বন্ধুকে পত্র দিয়ে উইলের কথা জানিয়েছিলেন, সে চিঠিও আমরা হস্তগত করেছি!—'

আমার কথা শুনে সহসা কালীনাথের মুখখানা যেন ছাইয়ের মতই ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

এবারে হঠাৎ রাঘব মিত্তির বলে উঠ্‌লো, 'হাঁ এ উইল জাল! ঐ কালীনাথ বাবুই আমাদের টাকা দিয়ে—'

অদ্ভুৎ পরিস্থিতি।

'তবে রে শালা!—' সহসা কালীনাথ বাঘের মতই রাঘবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যেতেই আমি তাকে দু'হাতে চেপে ধরলাম।

কালীনাথ তখনও গর্জাচ্ছে, 'Yon scoundrel! শয়তান! শেষ পর্যন্ত তুই—দে! দে আমার সব টাকা ফিরিয়ে দে!'

অনন্ত বিশ্বাস দেখি হঠাৎ ঐ ফাঁকে গুটি গুটি সরে পড়বার মতলবে এগিয়ে চলেছে দরজার দিকে। কিন্তু দরজার সামনে

হঠাৎ লাল পগড়ীর আবির্ভাব দেখে থমকে দাঁড়াল। পুলিশও ততক্ষণে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে, 'কোথায় যাচ্ছেন অনন্তবাবু! অভিনয়ের শেষ দৃশ্যটা দেখে যাবেন না?

'আমি!—আমি মানে—' আমতা আমতা করে অনন্ত বিশ্বাস কি যেন বলবার চেষ্টা করে।

'না! না—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, শালাকে আমি খুনই করবো—' কালীনাথ প্রাণপণে আমার কবল থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে, আর ক্ষুধিত বাঘের মত চেঁচাতে থাকে।

বুঝতে পারেনি কেউ শেষ দৃশ্যের তখনও বাকী!

রাঘব মিত্তির সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আসুন ইনেস্‌পেক্‌টার বাবু! আমি surrender করছি—' বলতে বলতে একটান দিয়ে মুখের ফ্রেঞ্চকাট্‌ দাড়িটা ও মাথার পরচুলা খুলে ফেললে।

সকলেই আমরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম রাঘব মিত্তির নয়, কিরীটি।

'একি কিরীটি তুই?—' আমার বিস্মিত কণ্ঠ থেকে কথাটা বের হয়ে এল।

এর চাইতে ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় অনন্ত বিশ্বাস ও কালীনাথ কম বিস্মিত হতো না।

বিস্মিত আমিও কম হয়নি।

কিরীটি যে শেষ পর্যন্ত এই ভাবে একটা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে

এতবড় একটা জাল উইলের ব্যাপার এত সহজে মীমাংসা করে দেবে—এ যেন আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

কালীনাথ স্তব্ধ। নির্বাক!

তার লাফালাফি চেঁচামেচি সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে হঠাৎ যেন কোন যাদুমন্ত্রে। লোকটা যেন বোবা হয়ে গিয়েছে একেবারে।

'রাঘব মিত্তিরকে এবার নিয়ে আসুন ইনেস্পেক্টার সাহেব!—'

কিরীটির নির্দেশে ও ইনেস্পেক্টারের ইংগিতে তখন দু'জন সাধারণ বেশধারী পুলিশের কর্মচারী দু'হতে দু'দিকে ধরে আসল ও সত্যিকারে রাঘব মিত্তিরকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এল।

'আসুন মিত্তির মশাই! আপনাকে ঘণ্টাচারেক পুলিশের হেফাজতে আটকে রাখবার জন্য সত্যই আমি দুঃখিত! এবারে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। শঠে শাঠ্যং নীতিটুকু অবলম্বন করতে হয়েছে আমাকে, একান্ত বাধ্য হয়েই। আশা করি এবারে—ভুবনেশ্বর বাবুর বাবার উইলের যে সত্যিকারের copyটা আপনার কাছে আছে—লক্ষ্মী ছেলের মত সেটা বের করে দেবেন।—' তারপর কালীনাথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাধ্য হয়েই আপনার মামা ভুবনেশ্বর বাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে এই অভিনয়টুকু করতে হয়েছে আমাকে। তবে ভুবানশ্বর বাবুও আমাকে কথা দিয়েছেন—সত্যিকারের উইলে আপনার স্ত্রী ও পুত্রের যা প্রাপ্য আছে তার চাইতেও কিছু বেশী টাকা আপনাকে উনি দেবেন!—'

ক্রোধরক্তিম চক্ষে কালীনাথ একবার ভুবনেশ্বরের দিকে

তাকিয়ে ঘৃণা ও বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বললে, 'ওর সে ভিক্ষার দানে আমি লাথি মারি! কালীনাথ হাত পেতে ভিক্ষা নেয় না কারো কাছ থেকে!—'

কিরীটির ইংগিতেই অতঃপর আমি কালীনাথের হাত ছেড়ে দিলাম!

কালীনাথ অন্দরের দিকে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা বিরাজ করে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কালীনাথ আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল। হাতে তার একটা কাগজ। কাগজটা কিরীটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'নিন এই উইল। My hat's off to you Kiriti Baboo! Good bye ভুবনেশ্বর মামা। Bad luck this time! চললাম—'

কালীনাথ ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কিরীটি নিঃশব্দে মাটি থেকে উইলটা তুলে ভুবনেশ্বরের দিকে এগিয়ে দিল। ভুবনেশ্বর ছোঁ মেরে নিল উইলটা।

'চল্ সুব্রত!—রাত হলো, বাড়ি যাওয়া যাক।—'

প্রথমে কিরীটি ও তার পশ্চাতে আমি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলাম।

॥ ৪ ॥

—ক—

রাত্রে কালীনাথের ওখান থেকে ফিরে প্রিয়নাথ অধিকারীর বাসায় নিমন্ত্রণ সেরে কিরীটি এসে শুয়েছিল। আমিও সে রাত্রে আর বাসায় ফিরেনি তার ওখানেই ছিলাম। টেলিফোনের মুহুর্মুহুঃ শব্দে ঘুম যখন ভাঙ্গল রাত তখনও শেষ হয়নি। শেষ রাতের পাতলা অন্ধকারের পর্দাটা প্রকৃতি জুড়ে থির থির করে কাঁপছে। একান্ত বিরক্ত চিত্তেই ঘুম-জড়িত চোখে হাত বাড়িয়ে শিয়রের ধারে ত্রি'পয়ের 'পরে রক্ষিত টেলিফোনের রিসিভারটা টেনে নিল: হ্যালো?

এবারে যা ঘটেছিল তাই বলি।

'মিঃ রায় আছেন কি?—চাপা পুরুষ কণ্ঠে অস্পষ্ট প্রশ্নটা ভেসে এলো।

'বলুন। কথা বলছি।—'

'ডোভার লেন থেকে কথা বলছি। প্রিয়নাথবাবু মারা গেছেন।—' স্তম্ভিত বিস্মিত কিরীটিকে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশ মাত্রও না দিয়েই অকস্মাৎ যেমন তারের বুকে শব্দ তরঙ্গ জেগে উঠেছিল তেমনি অকস্মাৎই আবার নিশ্চুপ হয়ে

গেল। কেবল অন্য প্রান্তে ঠুং করে একটি শব্দ জাগল মাত্র ফোনের রিসিভারটি রেখে দেবার।

কিরীটি কিন্তু ততক্ষণে শয্যার 'পরে সোজা হয়ে উঠে বসেছে এবং উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করছে : হ্যালো। শুনছেন, হ্যালো ?

কিন্তু বৃথাই। আর কোন সাড়া শব্দই অপর প্রান্ত হতে এলো না। কিরীটি শয্যার পরে বসে বসেই তখন অগত্যা আর একবার আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করলে প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত। ডোভার লেনের প্রিয়নাথ অধিকারী তার যথেষ্ট পরিচিত। সামনের ত্রি'পয়ের 'পরে রক্ষিত রেডিয়াম ডায়েলযুক্ত টাইম পিসটার দিকে তাকাল : রাত সাড়ে চারটে।

গ্রীষ্মের রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক আগেও কিরীটি ভদ্রলোককে জীবিত দেখে এসেছে। সন্ধ্যা হ'তে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত এবং সাড়ে নয়টায় আহারাদির পর রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত এক সঙ্গে বসে দাবা খেলেছে। তারপর শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়ে এসেছে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন কি হলো যে হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। আর কেইবা ফোন করলে এবং অমন করে হঠাৎ কথা না শেষ করে ফোন ছেড়েই বা দিল কেন ? প্রিয়নাথের বয়স প্রায় সত্তরের কাছা-কাছি হলেও অকৃতদার, কর্মঠ প্রিয়নাথের শরীরে কোথাও বার্ধক্য তার দাঁত বসাতে পারেনি। এখনও অটুট স্বাস্থ্য। সাধারণ প্রৌঢ়দের ইদানীং যে রোগটি—রক্তচাপ বৃদ্ধি ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে তাও ত তাঁর নেই। এখনো প্রত্যহ খুব ভোরে শয্যা

ছেড়ে উঠে মাইল দুই প্রাতঃভ্রমণ করে আসেন। প্রচুর খেতে পারেন এবং এই বয়সেও ভাইপোদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে নতুন করে কাঠের ব্যবসা সুরু করেছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী। নীরোগ, সুস্থ এবং সুখী লোকটা।

আবার কিরীটি ফোনটা তুলে নিল এবং প্রিয়নাথের বাড়ির নাম্বারটা চাইলে। কিন্তু অপর প্রান্তে রিং অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেলেও কোন জবাব পাওয়া গেল না।

অপারেটার বললে, 'Sorry no reply !'

এবারে আরো বিস্মিত হলো কিরীটি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র কৌতূহল মনের মধ্যে উঁকি দিলে। কিরীটি আর দেরী করে না। গায়ে জামা চাপিয়ে উঠে পড়ে এবং সোজা নীচে নেমে এসে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

ডোভার লেনে কিরীটি যখন এসে পৌঁছাল 'অধিকারী লজে'র কারোই বড় একটা তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি। আমেরিকান স্টাইলের সামনে লনওয়ালা দোতালা শাদা রংয়ের কংক্রিটের তৈরী বাড়ি। গাড়ি-বারান্দায় এসে গাড়ি থামাতেই প্রিয়নাথের পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ যোগেশের সঙ্গে দেখা হলো। যোগেশ সবে তখন ঘুম হ'তে উঠে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এই যে যোগেশ, তোমার বাবু কেমন আছেন ?—'

'বাবু! কেন ভালই আছেন এখনও ত ঘুমাচ্ছেন—কাল অনেক রাত্রে শুয়েছেন তাই এখনও হয়ত ওঠেন নি।—'

যোগেশের কথায় কিরীটি যেন নিজের অজ্ঞাতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে মনে মনে সকৌতুকে ভাবেঃ যাক্। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে বেশ একটু কৌতুক করা যাবে। মুখে বলেঃ চল উপরে যাওয়া যাক।

দোতলায় একেবারে টানা বারান্দার শেষপ্রান্তে প্রিয়নাথ বাবুর ঘরের সামনে এসে কিন্তু দেখা গেল ভিতর হতে ঘরের দরজা বন্ধ। এখনো ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙ্গেনি। আশ্চর্য! চিরদিন ভোরে ওঠাই ত ওর অভ্যাস।

'কই হে যোগেশ! তোমার বাবুর যে এখনো ঘুম ভাঙ্গেনি দেখছি!—'

'তাই ত।—' যোগেশ মৃদু করাঘাত করে বন্ধ দরজায় এবং ডাকেঃ বাবু! বাবু!—

কিন্তু কোন সাড়া নেই। এবারে জোরে জোরে করাঘাত করে ডাকেঃ বাবু! বাবু! কিরীটিবাবু এসেচেন।

না, কোন সাড়া নেই।

'প্রিয়নাথবাবু! প্রিয়নাথবাবু—' কিরীটিও নাতি-উচ্চকণ্ঠে দরজায় করাঘাত করে ডাকা ডাকি করে।

আশ্চর্য। তবু কোন সাড়া নেই।

যোগেশ এবারে পাশের জানালাটার কাছে এগিয়ে গেল এবং জানালার ভেজান পাল্লা দু'টো ঠেলে খুলে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে বিস্মিত কণ্ঠে বললেঃ আশ্চর্য! বাবু ত দেখছি চেয়ারেই বসে আছেন—

চকিতে কিরীটি যোগেশের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং খোলা জানালা পথে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে ঃ বড় একটা হেলান-দেওয়া চেয়ারে বসে আছেন প্রিয়নাথ—দেহের বাম অংশ ও টেবিলের পরে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তটি মাত্র দেখা যাচ্ছে তাঁর।

কিরীটি ও যোগেশ দু'জনেই আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকে, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না প্রিয়নাথ অধিকারীর। এদিকে ততক্ষণে পাশের ঘরের দরজা খুলে প্রিয়নাথের ভাইপো বিমল বের হ'য়ে এসেছে। ব্যগ্রকণ্ঠে শুধায় সে ঃ কি! ব্যাপার কী?

যোগেশ কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে ঃ বাবু! বাবুকে এত ডাকছি সাড়া দিচ্ছেন না।

'সাড়া দিচ্ছেন না? সে কি!—' উৎকণ্ঠিত বিমল জানালার সামনে এগিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকে ঃ জ্যোঠামণি! জ্যাঠা!

না। সাড়া নেই।

ক্রমে একে একে বাড়ির অন্যান্য সকলেই উঠে এসে ঘরের সামনে ভিড় করে। প্রিয়নাথের আর দুই ভাইপো বিকাশ ও বিমান্ এবং ভাইঝি সুজাতা। এমন কি প্রিয়নাথের ছোটি ভাই অমিয়নাথের বিধবা স্ত্রী সরমা দেবী, গত তিন বৎসর ধরে এই বাড়িতে নিয়মিত আসা যাওয়া সত্বেও একটি দিনের জন্য বা এক লহমার জন্যও কিরীটি কখনো যার ছায়া মাত্রও দেখেনি, অথচ প্রতি মুহূর্তে যার নিরন্তর সেবারত অদৃশ্য সেবা ও যত্নের নিদর্শন পেয়েছে, সেই রহস্যময়ী মধ্যবয়সী নারীও এক সময় এসে নিঃশব্দে সকলের থেকে কিছু দূরত্ব রেখে একটি পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ছোট খাটো মানুষটি। পরিধানে শুভ্র থান, নিরভরণা, অর্ধেক কপাল পর্যন্ত ঘোমটা। কিরীটি সরমার দিকে তাকিয়ে সত্যিই বিস্মিত হয় ঃ কেবলমাত্র সুন্দর বললেই বোধ হয় সুরমার সবটুকু বলা হলো না। আগুনের মত উজ্জ্বল সে রূপ অথচ চন্দনের মতই স্নিগ্ধ। ঈষৎ ঘোমটার সীমানা অতিক্রম করে কুঞ্চিত অলকের কয়েক গাছি কপালের দু'পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমেছে। দৃঢ় সংবদ্ধ ওষ্ঠ। সুগঠিত ধারালো চিবুক—টিকোল নাসা। বোবা দৃষ্টিতে কি এক মূক প্রশ্ন। বয়স তার যাই হোক, যৌবন যেন এখনও মনে হয় সমগ্র দেহটিকে তার আঁকড়ে রয়েছে। কে বলবে তিনি বিমল, বিকাশ, বিমান ও সুজাতাদের মা।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিরীটির পরামর্শেই ডিঃ ইনেসপেক্টার সলিল সেন ও স্থানীয় থানার O. C. সুদর্শন রক্ষিতকে সংবাদ দেওয়া হলো। তাঁরাই এসে ঘর খুলবেন। এ অবস্থায় নিজেরা দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা আইন-সংগত হবে না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই একে একে সকলে এসে হাজির হলেন এবং পুলিশের লোকেরাই দরজাটা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করল। সলিল সেন, সুদর্শন রক্ষিত ও কিরীটি তিনজনে সর্বপ্রথম ঘরে প্রবেশ করে। প্রথমেই কিরীটি তার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ঘরের সর্বত্র একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

শয্যা হ'তে অল্প দূরে হাত চার পাঁচ ব্যবধানে গদি মোড়া প্রশস্ত ব্যাকওয়ালা যে চেয়ারটার উপরে সাধারণতঃ প্রিয়নাথ

বিশ্রাম করতেন বসে—সেই চেয়ারটার উপরেই হেলান দিয়ে বসে আছেন প্রিয়নাথ। মাথাটা একটু হেলে আছে। ডান হাতটা মাত্র সামনের চৌকো শ্বেতপাথরের টেবিলটার 'পরে প্রসারিত এবং ঠিক প্রসারিত হাতের কাছে একটি ঘড়ি বসান টেবিল ল্যাম্প। ল্যাম্প্টা তখনও জ্বলছে। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলছে। টেবিলের 'পরে খানিকটা দুধ ছড়িয়ে আছে, কিছু অংশ তার শুকিয়ে গিয়েছে—কিছুটা এখনো শুকায় নি এবং ঠিক নিচে চেয়ারের পাশে একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে টুকরো টুক্রো হ'য়ে পড়ে আছে। মৃতের চোখে মুখে একটা বিরক্তি ও কষ্টের চিহ্ন তখনও যেন লেগে আছে। পরিধানে একটা মিহি ফরাসডাঙ্গার সৌখীন ধূতি ও গায়ে হাফহাতা পাত্লা নেটের গেঞ্জী স্বভাবত বাড়িতে যা তিনি পড়তেন। কোলের 'পরে একটা ফাইল পড়ে আছে। পায়ে জাপানী ঘাসের চপ্পল।

সলিল সেন ঝুকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করছিল কিরীটি তাকে সাবধান করে দেয়ঃ সাবধান সলিল, কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে চারিদিকে দেখো।

সলিল সেন সতর্ক হয়ে যায়।

কিরীটি অতঃপর ঝুকে নিচু হয়ে মেঝেতে কি যেন দেখবার চেষ্টা করেঃ হঠাৎ তার নজরে পড়ে মেঝেতে দু' ফোঁটা রক্তের দাগ কালো হয়ে শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। আর কোন পায়ের ছাপ বা অন্য কিছু তার নজরে পড়ে না। মৃতদেহও কিরীটি পরীক্ষা করে হঠাৎ নজরে পড়ে মৃতের প্রসারিত ডান হাতের

তর্জনীর অগ্রভাগে। তর্জনীর অগ্রভাগে ছোট্ট একবিন্দু পরিমাণ রক্ত জমে আছে কালো হ'য়ে, যেন কালো একটি ছোট্ট তিল।

মেঝের 'পরে ইতঃস্তত ছড়ানো ভাঙ্গা গ্লাসের কাচের একটা অংশের মধ্যে তখনও সামান্য যে দুধ ছিল সেটা আলাদা করে Chemical analysisয়ের জন্য কিরীটির পরামর্শ মত সরিয়ে রাখা হলো। প্রাথমিক তদন্তের পরে এবারে সকলের জবনবন্দী। ইতিমধ্যে কিরীটি একসময় প্লাগ, খুলে টেবিল ল্যাম্পটাও নিভিয়ে দিয়েছিল।

প্রিয়নাথ অধিকারীর সঙ্গে কিরীটির আজ বছর তিনেক আলাপ। দক্ষিণ কলকাতার এক ক্লাবে দাবার আসরে প্রথম অধিকারীর সঙ্গে কিরীটির পরিচয়। পরে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় হয় পরিণত। পরস্পরের দাবার নেশাই পরস্পরকে আকৃষ্ট করে। সেই হতেই মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এ বাড়িতে কিরীটির যাতায়াত সুরু হয়। প্রিয়নাথে নিজের মুখেই শোনা কিরীটির, পিতার দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামই একদিন প্রথম যৌবনে প্রিয়নাথকে যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জনের কঠোর প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে এবং মাত্র একুশ বৎসর বয়সেই কাউকে কিছু না জানিয়ে জাহাজে খালাসীর চাকরী নিয়ে প্রিয়নাথ বর্মামুলুকে পাড়ি জমান। প্রিয়নাথের পিতা তার এক বাল্যবন্ধুর মেয়ে সরমার সঙ্গে প্রিয়নাথের বিবাহ দেবেন বলে পূর্ব হতেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন। দুই বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের ফলে প্রিয়নাথ

ও সরমার মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও একসময় গড়ে উঠবার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ প্রিয়নাথ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় এবং তিন বৎসর পর্যন্ত তার আর কোন সংবাদ না পাওয়ায় শেষটায় কথা রাখবার জন্য কনিষ্ঠ পুত্র অমিয়নাথের সঙ্গেই সরমার বিবাহ দিয়ে যান তিনি। প্রিয়নাথের সংবাদ পাওয়া গেল দীর্ঘ বার বৎসর বাদে—অমিয়নাথ যখন সামান্য কেরণীর আয়ে চারটি সন্তান নিয়ে নিত্য অভাব অভিযোগের মধ্যে দিশেহারা হ'য়ে উঠেচেন।

নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের নিকট হ'তে সৌভাগ্যের সংবাদ বহন করে ঐ সঙ্গে দশ হাজার টাকার এক ড্রাফট্ পিনযুক্ত হয়ে পিতার কাছে এল চিঠি: বাবা, না বলে চলে এসেছিলাম বলে ক্ষমা করবেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দারিদ্র্যকে জয় করে আপনার চরণে প্রণত হবো। প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ হয়েছে। আর একটা কথা, সরমার যদি এখনো বিবাহ না হ'য়ে থাকে তবে জানাবেন।

কিন্তু হায় এই সৌভাগ্যের আনন্দ গ্রহণ করতে হতভাগ্য পিতা সেদিন আর জীবিত ছিলেন না। সাত বৎসর পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছিল দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে শরীর ভেঙ্গে গিয়ে। জবাব এলো ছোটভাই অমিয়নাথের কাছ হ'তে এবং অতি সংকোচের সঙ্গে ছোট্ট একটি কথায় চিঠির শেষাংশে সে জানাল—সরমা তারই স্নেহের ভ্রাতৃবধূ এখন।

ঐ চিঠির জবাব প্রিয়নাথ আর দেন নি, তবে নিয়মিত ভাইয়ের নামে এরপর হ'তে অর্থ সাহায্য আসতে লাগল। সেই অর্থেই ডোভার লেনে বছর তিনেক বাদে বাড়ি হলো, কিন্তু বাড়ি

শেষ হওয়ার মাস চারেক বাদেই অমিয়নাথ হঠাৎ একদিন রক্ত-চাপ-আধিক্যে মারা গেলেন। তারও অনেক পরে গত মহাযুদ্ধের হিঁড়িকে প্রকাণ্ড ব্যবসা ও বাড়ি ঘর-দুয়ার ও সেখানকার ব্যাংকে গচ্ছিত সমস্ত কিছু ফেলে কেবলমাত্র প্রাণটি হাতে করে ষাটের কোঠা পেরিয়ে দীর্ঘকাল পরে প্রিয়নাথ আবার বাংলা দেশে ফিরে এলেন। সমস্ত কিছু হারিয়েও কলকাতাব ব্যাংকে তখনও তাঁর যা গচ্ছিত ছিল তাও লক্ষাধিকের উপরে। বড় ভাইপো বিমলের বয়স তখন ৪১, মেজ বিকাশের ৩৯, বিমানের ২৫ এবং ভাইঝি সুজাতার বয়স বছর একুশ।

বিমল বাপ-মার আদরে লেখাপড়াও যেমন বিশেষ কিছু করেনি তেমনি অলস প্রকৃতির ও অমিতব্যয়ী এবং বিলাসী। ইলেকটিক মেকানিক কিছু কিছু জানে এবং নিজের একটা ছোট ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির দোকানও আছে। মেজ বিকাশ সায়েন্সের ষ্টুডেণ্ট এখনো—এম্ এস্-সি পাশ করে ডকটরেটের থিসিস্ নিয়ে ব্যস্ত। নিজের লেখাপড়া ও রিসার্চ তাতেই সে সর্বদা মশগুল। ছোট বিমান প্রিয়নাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং কর্মঠ শক্তিশালী —জ্যাঠার ব্যবসায়ের বর্তমানে দক্ষিণ হস্ত। মেয়ে সুজাতাও বি-এ ক্লাশের ছাত্রী। সুজাতার রূপ যেন তার মায়ের রূপকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রিয়নাথের বাড়ির সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। ব্যবসা দেখাশোনা ছাড়া বাকী যে সময়টা বাড়িতে থাকতেন দো'তলার নিজের ঘরটিতেই থাকতেন। বহুকালের প্রিয় নিত্যসহচর পুরাতন ভৃত্য যোগেশ ও সুজাতাই তাঁর যা কিছু

দেখা শোনা করত। তবে ঐ দুইজন ছাড়াও অদৃশ্য নিরন্তর-সেবাপরায়ণ স্নেহময় দু'টি হাতের আভাষ যা অতি বড় অন্ধেরও দৃষ্টিকে এড়াত না—ঘিরে ছিল প্রিয়নাথকে কলকাতায় আসা অবধি সর্বদা। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেই অন্তঃপুরচারিণীর প্রতি প্রিয়নাথেরও শ্রদ্ধার যেন অবধি ছিল না। অথচ পাঁচ বৎসর এই বাড়িতে থেকেও প্রিয়নাথের সঙ্গে একটিবারের জন্যেও তার চোখাচোখি হয়নি। নিভৃত সংগোপনে সে যেন নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। ঠিক নিয়মিত সময়ে স্নানের তাগাদা, সকালের জল-খাবার, দ্বিপ্রহরের পরিচ্ছন্ন পরিবেশিত আহার্য, রাত্রে শয়নের পূর্বে এক গ্লাস গরম দুধ—ঠিক আছে কোন ব্যতিক্রম নেই।

ইদানিং প্রিয়নাথের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতা হওয়ায় কিরীটি প্রিয়নাথের জীবনের অনেক খুঁটিনাটিই জেনেছিল।

—খ—

প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা করে জবানবন্দী নেওয়া হলো সুরু।

প্রথমেই ডাক পড়লো বিমলের: শরীর খারাপ থাকায় আগের দিন সে একটু আগেই শয্যার আশ্রয় নিয়েছিল এবং সকালে ওদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গেচে। রাত্রে একবারও তার ঘুম ভাঙ্গেনি। প্রিয়নাথের পাশের ঘরেই সে থাকে কিন্তু দুই ঘরের মধ্যে যাতায়াতের কোন রাস্তা নেই। গতকাল

বিকেলের দিকে একবার, বিমলের সঙ্গে প্রিয়নাথবাবুর দেখা হয়েছিল। তারপর আর দেখা হয়নি। বিমানের সঙ্গেই বোধ হয় প্রিয়নাথবাবুর শেষবার দেখা হয়েছিল—রাত পৌনে বারটায়। দাবা খেলার পর কিরীটি চলে গেলে, ব্যবসা সংক্রান্তই বিশেষ একটা জরুরী কাজে বিমান জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ঘরে গিয়েছিল।

কিরীটিই প্রশ্ন করে ঃ সে সময়ে তিনি কি করছিলেন ?

'একটা ফাইল নিয়ে যেন কি দেখছিলেন ?—'

'মনে পড়ে কি আপনার সে সময়ে দুধের গ্লাসটা কোথায় ছিল ?—'

'টেবিলের 'পরেই ছিল। এবং দুধ তখনও গ্লাস ভর্তিই ছিল, খাননি।—'

'সে সময় তাকে কোনরূপ অসুস্থ বা কিছু দেখেছিলেন ?—'

'না। বেশ হেসে হেসেই ত আমার সঙ্গে গল্প করলেন।—'

'কতক্ষণ ছিলেন আপনি ?—'

'মিনিট পনেরর বেশী নয়।—'

'ঐ সময় টেবিল ল্যাম্পটা কি জ্বলছিল ?—'

'মনে নেই ঠিক।'

'আপনার প্রতি আপনার জ্যোঠার মনোভাব কেমন ছিল ?—'

'ভালই। তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমায়।—'

'ব্যবসা সংক্রান্ত কথা ছাড়া অন্য কোন কথা তার সঙ্গে আপনার গত রাত্রে হয়েছিল ?'

'না।—'

'আপনার জ্যাঠার কোন উইল আছে জানেন?—'

'জানি। তবে উইলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।—'

'আপনার জ্যাঠার কোন শত্রু ছিল বলে জানেন?—'

'না। তার মত লোকের শত্রু থাকতে পারে আমার কল্পনারও অতীত।'

'আচ্ছা আপনার কোন আংটি হারিয়েছে?—' কিরীটির প্রশ্নে বিমল হাত দেখে বলেঃ আমার আংটি ত আমার আঙুলেই আছে।

*　　*　　*　　*　　*

এবারে বিকাশ। গত রাত্রে প্রায় দুটো পর্যন্ত সে ল্যাবরেটারীতে ছিল। রাত দুটোর পর বাড়ি ফিরে সোজা শয্যায় আশ্রয় নেয়।

'আপনাকে দো'তলার সিঁড়ির দরজা খুলে দেয় কে?—' কিরীটি প্রশ্ন করে।

'আমার মা!—'

'আমি যতদূর জানি বিকাশবাবু আপনার জ্যাঠার সঙ্গে আপনার খুব সম্প্রীতি ছিল না। Am I wrong?—'

'সম্প্রীতি বলতে আপনি ঠিক কি mean করছেন জানি না মিঃ রায়, তবে শুধু তার সঙ্গে কেন—আপনি যখন এতটাই জানেন একথাও নিশ্চয়ই জানেন এ-বাড়ির সঙ্গেই আমার বিশেষ

সম্পর্ক কোন দিনই নেই। আমার রিসার্চ নিয়েই আমার সময় কাটে।—'

'তা জানি। আচ্ছা আপনার জ্যাঠার উইলের কথা আপনি জানেন?—'

'জানি। মানে শুনেছি, কিন্তু সে ব্যাপারে আমার কোন interestই নেই!—'

'আশ্চর্য। কেন বলুন ত?—'

'কেন শুনবেন? I used to hate that miser!—'

'কিন্তু আমি, তাকে এই তিন বৎসরে যতদূর চিনেছি he was not a man of that type! সে প্রকৃতির লোক ত তিনি ছিলেন না!—'

'থাক মশাই। মায়ের সংবাদ মাসীর মুখে আমি শুনতে চাই না। দেখুন আমার সময়ের দাম আছে। ল্যাবরেটারীতে এখন আমার অনেক কাজ। আমায় ছেড়ে দিলে বাধিত হলো।—'

'আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।—'

এর পর ডাক পড়ল সুজাতার।

সুজাতা বললে, রাত সাড়ে এগারটায় কিরীটি চলে যাওয়ার পরই দুধের গ্লাস নিয়ে সেই জ্যাঠার ঘরে যায়। তিনি তখন চেয়ারে বসে একটা ফাইল দেখছিলেন।

'কি কথা হয়েছিল আপনার তাঁর সঙ্গে?—' প্রশ্ন এবারেও কিরীটিই সুরু করে।

'তিনি বলেছিলেন—নতুন কি উইল করবেন সেই কথা?—'

'নতুন উইল !—'

'হাঁ।—'

'কি ভাবে নতুন উইল করবেন তা কিছু বললেন ?—'

'না। কেবল বলেছিলেন ছ' একদিনের মধ্যেই নাকি নতুন উইল করবেন।—'

'আপনাদের ভাই বোনেদের মধ্যে প্রিয়নাথবাবু সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন কাকে বলে সুজাতা দেবী আপনার মনে হয় ?—'

'মেজদাকে ও আমাকে বলেই মনে হতো !—'

'বিকাশবাবুকে ?—'

'ইদানিং তার ব্যবহারে জ্যাঠামণি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন।—'

'কেন ?—'

'ছোটদা জ্যাঠামণির কাছে হাজার চল্লিশ টাকা চেয়েছিলেন নিজস্ব একটা ল্যাবরেটারী করবার জন্য, কিন্তু জ্যাঠামণি রাজী হননি। তাই নিয়েই মনোমালিন্য।—'

কিরীটি তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে: আপনার কোন আংটি হারিয়েছে কি ? জবাবে সুজাতা হাতের আঙুল দেখে বলে: না, আংটি ত হাতেই আছে।

* * *

এবারে ডাক পড়লো সরমা দেবীর। নিঃশব্দ পদে সরমা কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

'বসুন সরমা দেবী ! একান্ত বাধ্য হয়েই আপনাকে বিরক্ত করলাম—'

সরমা বসলেনও না, কিরীটির কথার কোন জবাবও দিলেন না—যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন।

'কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই—'

'বলুন ?—' ধীর প্রশান্ত কণ্ঠস্বর।

'রাত দু'টোর সময় আপনি বিকাশবাবুকে দরজা খুলে দেন—সে সময়ে কি আপনি জেগে ছিলেন ?—'

'হাঁ বিকাশ বাড়ি ফেরেনি, তাই বসে একটা বই পড়ছিলাম।—'

'তারপর শুতে যান কখন ?—'

'আরো ঘণ্টাখানেক পরে বোধ হয়।—'

'বিকাশবাবু আসার আগে বা পরে যতক্ষণ আপনি জেগেছিলেন বাইরের বারান্দায় কোন রকম শব্দ শুনতে পেয়েচিলেন কি ?—'

সরমা দেবী চুপ।

'আমার প্রশ্নের জবাবটা দিন ?—'

একটু ইতঃস্তত করে : না।

'কোন রকম শব্দই শোনেন নি ?—'

'না !—'

'কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গার শব্দ ?—'

'না !—'

'আপনার ডান হাতের আঙুলে ন্যাকড়ার পট্টি একটা বাঁধা দেখছি। কি হয়েছে আঙুলে?—'

কিরীটির অতর্কিত প্রশ্নে সরমা চমকে ওর মুখের দিকে তাকান এবং একটু ইতঃস্ততঃ করে বলেন: কেটে গিয়েচে।

'কি করে কাটল? কবে কাটল?—'

'কাল তরকারী কাটতে গিয়ে!—'

হঠাৎ কিরীটি বলে উঠল যেন কতকটা আকস্মিকভাবেই।

'কিন্তু আমি যদি বলি—কাল রাত্রে কোন এক সময় প্রিয়নাথবাবুর ঘরে ঢুকে গ্লাসের ভাঙ্গা কাঁচের টুক্‌রোয় অসাবধানবশতঃ আপনার আঙুলটি আপনি কেটেছেন সরমা দেবী?—'

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো। সলিল ও সুদর্শন দু'জনেই যেন স্তম্ভিত বিমূঢ়। নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে সরমা দেবী। বোবা! কণ্ঠে শব্দমাত্র নেই।

'কি বলেন সরমা দেবী! আমার অনুমান কি মিথ্যে?—'

'হাঁ!—'

'মিথ্যে —' কঠিন তীক্ষ্ণ কিরীটির কণ্ঠস্বর।

'হাঁ মিথ্যে! ওঘরে আজ পাঁচ বৎসর আমি পা দিইনি!—'

'পাঁচ বৎসরের কথা আমি জানি না তবে কাল রাত্রে আপনি গিয়েচিলেন!—' বলতে বলতে চকিতে কিরীটি সরমার বা হাতের অনামিকার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে কতকটা যেন আদেশের সুরেই বলে: বাঁ হাতের অনামিকায় আপনার আংটিটা কই সরমা দেবী?

'আংটি ?—' কতকটা স্বগতোক্তির মতই যেন কথাটা উচ্চারণ করে ভূতগ্রস্তের মত বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে সরমা তাকান কিরীটির মুখের দিকে।

'হাঁ। আপনার আংটি!—' বলতে বলতে পকেট হ'তে একটা মীনা করা 'S' লেখা সোনার আংটি বের করে হাতটা আংটি সমেত সামনের দিকে প্রসারিত করে বলে: দেখুন ত এইটাই আপনার হারান আংটি কি না ? প্রিয়নাথবাবুর বাথরুমে ওয়াশিং বেসিনে পেয়েছি। আপনার আঙুলের দাগই প্রমাণ করছে হাতের আঙুলে আপনার কোন আংটি ছিল, কিন্তু বর্তমানে নেই।

একটু থেমে এবারে কিরীটি বলে: শুনুন সরমা দেবী! আমি কিরীটি রায়। আমি বলছি—গত রাত্রে আপনি প্রিয়নাথ-বাবুর ঘরে গিয়েচিলেন এবং কাঁচের টুক্‌রোতে আপনার আঙুল কাটে। বাথরুমে রক্ত ধুতে গিয়ে অসাবধানবশতঃ কোন এক সময় নিশ্চরই সাবানে পিছলে আঙুল থেকে আংটি খুলে বেসিনে পড়ে যায়—সেই সময়কার মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য ব্যাপারটা আপনার নজরে হয়ত পড়েনি। আরো আমি বুঝতে পারছি—ঘরে ঢুকবার পর নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেচিল যার জন্য বিশেষ চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন আপনি।—

তথাপি নিশ্চুপ সরমা দেবী!

'বলুন, কখন আপনি কাল রাত্রে ঐ ঘরে গিয়েছিলেন এবং কেনই বা গিয়েচিলেন ?—'

'আমি আপনার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবো না কিরটি-বাবু!—' শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন সরমা দেবী।

'জবাব দেবেন না ?—'

'না !—' বলে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সরমা কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

—গ—

মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে দেখা গেল তীব্র Curare বিষ প্রয়োগেই প্রিয়নাথ অধিকারীর মৃত্যু হয়েছে। গ্লাসের দুধ ক্যেমিকেল এ্যনালিসিস্ করে কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। তাহ'লে কিভাবে বিষ প্রয়োগ হলো এবং উপরের তলার একটা নক্সা কাগজে এঁকে নিয়ে কিরীটি ভাবছিল সে রাত্রে কার পক্ষে প্রিয়নাথকে বিষপ্রয়োগ করা সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভব ছিল ? প্রিয়নাথকে বিষপ্রয়োগে হত্যার পূর্বে বা পরে সেই কক্ষে ঐ রাত্রে সরমা দেবী নিশ্চয়ই প্রবেশ করেচিলেন। কিন্তু কেন ?

প্রিয়নাথের এ্যটর্নী কমলবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, প্রিয়নাথের উইল অনুসারে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টন করা আছে : বাড়িটা পাবে সরমা এবং তার মৃত্যুর পর পাবে বিকাশ—তার ইচ্ছামত ল্যাব্রো-

টায়ী করবার জন্য এবং নগদ ত্রিশ হাজার টাকাও পাবে। আর বাকী ব্যাংকের মজুদ টাকা সমান ভাগে দশ হাজার টাকা সুজাতার বিবাহ খরচ বাদ দিয়ে প্রত্যেকে কুড়ি হাজার করে বিমান ও বিমল পাবে। নতুন উইলের কথা এ্যটর্নীও প্রিয়নাথের মৃত্যুর দিন দশ বারো আগে একবার শুনেছিলেন বটে, তবে কি ভাবে হবে সে সম্পর্কে কিছু তখনও তিনি বলেন নি বা কোন নির্দেশ দেননি। এক্ষেত্রে তাই দেখা যাচ্ছে প্রিয়নাথকে হত্যা করার মোটিভের দিক দিয়ে বিমল, বিমান বা বিকাশ কেউই সন্দেহের তালিকা হ'তে বাদ পড়ে না। কিন্তু কথা হচ্ছে—কি কারণেই বা হঠাৎ কিছুদিন পূর্বে প্রিয়নাথ নতুন উইল করতে মনস্থ করলে এবং করেন কি ভাবেই বা করতেন।

ভৃত্য জংলী এসে সংবাদ দিল প্রিয়নাথের ভৃত্য যোগেশ এসেছে। যোগেশকে ঐ ঘরেই পাঠিয়ে দিতে বললে কিরীটি।

যোগেশ ঘরে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

'কি খবর যোগেশ ?—বোস !—' যোগেশকে বসতে বলে কিরীটির হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় বিদ্যুৎ-চমকের মতই এবং কোনরূপ দ্বিধামাত্রও না করে সরাসরি প্রশ্ন করে : যোগেশ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। তুমি প্রিয়নাথবাবুর অনেক দিনকার পুরাতন লোক, তাই না ?

'তা বাবু সারাজীবটাই ত বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গিয়েছে—' বলতে বলতে বৃদ্ধের দু'চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে।

'আচ্ছা যোগেশ, সরমা দেবীর সঙ্গে তোমার বাবুর কি রকম সম্পর্ক ছিল ?—'

যোগেশ মাথা নিচু করে।

'বল। জবাব দাও। তোমার বাবুকে যে হত্যা করেছে নিশ্চয়ই তুমি চাও তার শাস্তি হোক ?—'

'নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু বাবু ছোটমা একাজ কখনো করেন নি !—'

'তা জানি, কিন্তু তোমার ছোটমা প্রায়ই রাত্রে তোমার বাবুর ঘরে যেতেন—তাই না ?—'

'যেতেন !—' তারপর একটু ইতস্তত করে বলে : একদিন অনেক রাত্রে বাবুর ঘরে আলো জ্বলতে দেখে হঠাৎ ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি বাবু চেয়ারে বসে আছেন—ছোটমা চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ও আস্তে আস্তে দু'জনে কি যেন সব কথাবার্তা কইচেন !—

কিরীটি কিছুক্ষণ কি যেন মনে মনে ভাবে, তারপর আবার এক সময় যোগেশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে : হাঁ, তুমি কি জন্য এসেছো তাত কই বললে না যোগেশ ?

'আপনার কথামত বাবুর ঘরে তালা দেওয়াই ছিল। আজ সকালে উঠে দেখি ঘরের তালাটা ভাঙ্গা।—'

'বলকি ?—'

'হাঁ। কিন্তু এখনো জানিনা কিছু চুরি গেছে কি না ঘর

থেকে ?—তবে আমি আর একটা নতুন তালা এনে আজ সকালেই লাগিয়ে দিয়েছি দরজায় বাবু।—'

'কখন তালাটা ভাঙ্গা তোমার নজরে পড়েছে ?—'

'আজ সকালে।—'

'আচ্ছা তুমি যেতে পারো।—'

* * * *

যোগেশ চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই সলিল সেন এলো। মুখে তার জয়ের হাসি।

'কি খবর সলিল ?—'

'তোমার অনুমানই ঠিক কিরীটি।—' বলতে বলতে পকেট হতে একটা ছোট্ট ব্রাউন রংয়ের পাউডার ভরা শিশি বের করে বলে : এই দেখ। Curare powder—most powerful poison।

'তাত বুঝলাম, কিন্তু ওটা পেলে কোথায় ?—'

সায়েন্স কলেজে বিকাশের ল্যাব্রোটারী ঘরে যেখানে সে রিসার্চ করে—তার রিসার্চ টেবিলের ড্রয়ারে। এবারে দু'য়ে দু'য়ে চার মিলে যাচ্ছে। শুধু এই নয়, দেখ—একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জও পেয়েছি তার ড্রয়ারে।—'

'বিকাশের টেবিল যখন সার্চ করো, বিকাশ ছিল ?—'

'ছিল ! এ শিশিটা সে তারই বললে, ঐ বিষটি নিয়েই সে বর্তমানে রিসার্চ করচে ! তবে সিরিঞ্জটার কথা সে নাকি বিন্দু

বিসর্গও কিছু জানে না। তা সে নাই জানুক, আপাততঃ তাকে আমি arrestও করেছি।—'

'বেশ করেছো।—' নিরাসক্ত কণ্ঠে কিরীটি জবাব দেয়।

'ব্যাপার কি, তুমি যেন বিশেষ উৎসাহ বোধ করছো না?—'

'না। তার কারণ ওই দু'টি বস্তুর দ্বারাই তুমি কিছু প্রমাণ করতে পারবে না যে বিকাশই প্রিয়নাথের হত্যাকারী!—'

'কিন্তু তার সঙ্গে I mean বিকাশ ও প্রিয়নাথবাবুর মধ্যে প্রীতির সম্পর্কও ছিল না এওত আমরা জানি। তাছাড়া আমরা ত জানি উইল অনুযায়ী প্রিয়নাথের মৃত্যুতে সেই বেশী লাভবান হবে—তার চির আকাঙ্ক্ষিত ল্যাবরেটারী গড়ে তুলতে পারবে।—'

'তবু—however I wish you success!—' পূর্ববৎ নিরাসক্ত কণ্ঠেই কিরীটি কথাগুলো বলে।

ঐ দিনই সন্ধ্যার সময়। কিরীটি ঘরে আলো জ্বালায়নি। অন্ধকারেই চুপটি করে বসে আছে, মৃদু পদশব্দ তার কানে এলো।

'কে?—'

সর্বাঙ্গ চাদরে আবৃত অস্পষ্ট ছায়ার মত এক মূর্তি তার কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

'কে?—'

ছায়া মূর্তি কিরীটির প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে আবার ঘর হতে বের হ'য়ে গেল। বিস্মিত হতভম্ব কিরীটি

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় ঃ কিন্তু ছায়ামূর্তি তখন দ্রুত পদে সিঁড়ি অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে নিচে।

'কে! শুনুন! শুনুন!—'

তবু সে ফিরল না।

বিস্মিত কিরীটি ঘরে ফিরে এসে সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বালাল এবং দেখতে পেলে একটা শাদা খাম মেঝেতে পড়ে আছে। খামের উপরে তারই নাম লেখা। খামটা তুলে নিয়ে কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে খামটা ছিঁড়ে ফেলে ঃ একটা চিঠি।

কিরীটিবাবু,

আমার পুত্র বিকাশকে আপনারা গ্রেপ্তার করেচেন, কিন্তু আমি বলচি সে নির্দোষ। সে একটু রগচটা ও খামখেয়ালী বটে কিন্তু আমি ত তার মা। আমি জানি এত বড় অন্যায় সে করতে পারে না। তাছাড়া বিকাশ বাড়ি ফিরবার পূর্বেই তাঁর ঘরে আমি গিয়েচিলাম তখনিই দেখেছি তিনি মৃতই। তাকে হত্যা করে নিজেও পাপের প্রাশ্চিত্ত করবো—আত্মহত্যা করে বলেই তার ঘরে সে রাত্রে যাই। অস্বীকার করবো না আজ আর, কোন কথাই। আপনি হয়ত জানেন না আমার জীবনের কিশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে প্রথম যাকে দেখে আমার কুমারী হৃদয় মুগ্ধ হয়ে ভালবেসেছি তিনিই প্রিয়নাথ। কিন্তু নির্মম ভাগ্যলিপি আমার ছিল অন্য রকম। তাই পেয়েও তাকে পেলাম না। তবু—তাকে আমি কোনদিনই ভুলতে পারিনি! দুর্বলা নারী আমি তাই জোর গলায় বাবাকে আমি তার ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহের সময় অমত জানাতে

পারিনি। বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তারপর দীর্ঘ দিনের অদর্শনে ক্রমে মনের সে ক্ষত শুকিয়েও এসেছিল কিন্তু যখন সে ফিরে আবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল, ডাকলে সরমা বলে, সব বিস্মৃত হলাম। প্রেম বা ভালবাসা বলতে আপনারা কি বুঝবেন জানি না এবং মানুষের সাধারণ চোখে প্রেম বা ভালবাসার যে সংজ্ঞা আমাদের ক্ষেত্রে তাও খাটবে না। তবু সেই মুহূর্তে যেন আমার কাছে জীবনের সমস্ত পুণ্য ধর্ম সব মিথ্যে হয়ে গেল। ভাবলাম এইত আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ। এবং যে স্বর্গ হতে নিয়তি একদিন আমাকে ছিন্ন করেছিল আজ সে স্বর্গ হতে নিজেকে কোন লোভেই দূরে সরিয়ে নিতে পারলাম না। তারপর চোরের মত সংগোপনে প্রতি রাত্রে তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছি। পাপ পুণ্য জানি না—জানি না সত্য মিথ্যা—এইটুকুই জানি মনে মনে চিরদিন তাকেই স্বামী বলে জেনে এসেছি। হঠাৎ এমন সময় একদিন জানতে পারলাম আমার এ গোপন বিহার আর একজন জানতে পেরেচে—সে আমারই আত্মজ—আমার কনিষ্ঠ পুত্র বিকাশ। ভাবতে পারেন এ কতবড় লজ্জা। একি গ্লানি! বিকাশ আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করলে, কিন্তু তবু নিজের গতিরোধ করতে পারলাম না। অবশেষে এক রাত্রে বিকাশ আমার পথ আগলে দাঁড়াল: মাথা নিচু করে ফিরে এলাম। তারপর—দুটো দিন ও রাত কি ভাবে যে আমার কেটেচে তা আমিই জানি—কি সংশয় কি দ্বন্দ্ব! তারপরই শেষ প্রতিজ্ঞা নিই, তাকেও হত্যা করবো নিজেও প্রাণ দেবো। ভাবতেও পারবেন না

হয়ত কোথায় কোন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ালে মানুষ অমন প্রতিজ্ঞা নেয়। যাহোক যা বলছিলাম, এদিকে বিকাশের ঐ ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠার সঙ্গে তার হলো ঝগড়া। তাই চটে গিয়ে বোধহয় তিনি নতুন উইল করবেন স্থির করেন। শুনলাম গ্রেপ্তারের পর নাকি সে আপনাদের কাছে ঐ ব্যাপার সম্পর্কে কোন জবানবন্দী দিতে চায়নি, তার কারণ তারই এই অভাগিনী জননী! সত্যি সে রাত্রে তাকে হত্যা করতে গিয়েই মৃত দেখে ফিরে আসতে গিয়ে অসাবধানবশতঃ হাতে লেগে দুধের গ্লাসটা পড়ে ভেঙ্গে যায় এবং সেই গ্লাসের কাঁচের টুকরো তুলতে গিয়েই আঙুল কাটে। বাথ-রুমে সেই হাত ধুতে গিয়েই বোধহয় আংটি পড়ে গিয়েছিল। আপনার অনুমানই সত্য। তবু বলছি, তাকে যদি কেউ হত্যা করে থাকে ত সে আমি। বিকাশ নয়। তাকে মুক্তি দিন—আমায় আপনি ঘৃণা করুন, তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু আমি তার মা। আমি বলছি সে নির্দোষ।

ইতি অভাগিনী—'সরমা'

সরমার দীর্ঘ চিঠিটা শেষ করে কিরীটি আর একটা মুহূর্তও দেরী করে না। তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে ছোটে 'অধিকারী লজের' দিকে। যাবার আগে থানায় সলিলকে একটা ফোন করে যায়। কিন্তু 'অধিকারী লজে' গিয়ে দেখে—সরমা দেবী বাড়িতে নেই এবং কেউই বাড়ির মধ্যে বলতে পারলে না—কখন সরমা দেবী কি অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হ'য়ে গিয়েচেন।

কিরীটি, বিমল ও বিমানের সমস্ত অনুসন্ধানই দু'দিন ধরে ব্যর্থ হলো—সরমা দেবীর কোন সংবাদই আর পাওয়া গেলনা।

কিরীটির অনুরোধে বিকাশকে মুক্তি দেওয়া হলো, কিন্তু আসল হত্যাকারীর কোন কিনারাই হলো না।

*   *

আরো দিন দুই বাদে কিরীটি দ্বিপ্রহরে বসে বসে প্রিয়নাথ অধিকারীর হত্যাকারীর কথাই ভাবছিল, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎচমকের মতই একটা সম্ভাবনা তার মনে উঁকি দিয়ে যায় এবং সেই দিনই বিকালের দিকে আবার কিরীটি প্রিয়নাথের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। প্রিয়নাথের ঘরটা আর একবার ভাল করে দেখতে হবে। যোগেশের কাছ হ'তে চাবি নিয়ে দরজা খুলে কিরীটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। যোগেশও সঙ্গে আছে। সরমা দেবীর অন্তর্ধানের ব্যাপারে যোগেশের মুখে এঘরের তালা ভাঙ্গার সংবাদ পাওয়া সত্বেও কিরীটি ঘরটা পরীক্ষা করতে পারেনি এবং মনেও ছিল না আকস্মিকভাবে চিঠি একটা দিয়ে সরমা দেবী নিরুদ্দিষ্টা হওয়ায়। তালা দোতালার ঘরে—ভাঙ্গতে হলে একমাত্র এ বাড়িরই কেউ ভেঙ্গেছে। কিন্তু কেন? কোন মারাত্মক প্রমাণ অপসারণের জন্য কি? সেটা কি? যা কিরীটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকেও এড়িয়ে গিয়েছে। কি এমন প্রমাণ—কিরীটির নজরে পড়ল না। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কিরীটি। হঠাৎ সামনের চৌকো শ্বেতপাথরের টেবিলটার

পরে নজর পড়ে—টেবিল ল্যাম্প্! টেবিল ল্যাম্প্টা কোথায় গেল ?

'ঐ টেবিলের পরে যে ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্প্টা ছিল সেটা কোথায় গেল যোগেশ ?'

'টেবিল ল্যাম্প্ ? জানিনা ত ?—'

টেবিল ল্যাম্প্! টেবিল ল্যাম্প্! কেন ? কেন সেটা চুরী গেল ? Curare বিষপ্রয়োগে মৃত্যু! চকিতে মনে পড়ে মৃতের ডান হাতের আঙুলে একটি রক্ত বিন্দু!

কিন্তু কোথায়। কোথায় সেই ল্যাম্প। কে চুরী করলে সে ল্যাম্প! কে চুরী করতে পারে ?—হত্যাকারী!

হ্যাঁ হত্যাকারীই!

—ঘ—

যোগেশের কাছেই ঠিকানাটা পাওয়া গেল! বেশী দূরে নয়, রসারোডের উপরেই।

থানা হ'য়ে সুদর্শন রক্ষিতকে এবং দু'জন পুলিশকে নিজের গাড়িতেই তুলে নিয়ে কিরীটি গাড়ি চালাল এবারে রসারোডের দিকে সোজা।

রসারোডের উপরেই দোকানটা : দি মডার্ণ ইলেকটিক্যাল ষ্টোরস্।

মাঝারী সাইজের দু'খানা ঘর নিয়ে দোকানটা। নতুন

পুরাতন নানা জাতীয় ইলেকট্রিক আলো, ফ্যান, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে ঘর দু'টো একেবারে যেন ঠাসা। দু'জন কর্মচারী এবং মালিক। সামনের ঘরেই দোকানের মালিক একজন কর্মচারীর সঙ্গে কি একটা ইলেকট্রিকের যন্ত্র নিয়ে কথা বলছিলেন। কিরীটিকে দোকানে প্রবেশ করতে দেখে মালিক উঠে দাঁড়ায়ঃ একি! কিরীটিবাবু যে! আসুন। আসুন—কি সৌভাগ্য আমার। ওরে জনার্দ্দন একটা চেয়ার দে।

'থাক। ব্যস্ত হবেন না। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম—'

'বিলক্ষণ। কি বলুন ত?—'

'একটি টেবিল ল্যাম্প—ঘড়ি বসান ঠিক যেমনটি আপনার জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘরের টেবিলে একটি আছে!—'

বিমল কিরীটির মুখের দিকে তাকায় এবং মৃদু কণ্ঠে বলেঃ সে রকম টেবিল ল্যাম্প ত আমার কাছে নেই।

'কিন্তু আমার ধারণা আছে। এবং একটি নয় দু'টি!—'

'একটি নয় দুটি, কি বলছেন আপনি?—' বলতে বলতে চেয়ার ঠেলে বিমল উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

'উঁহুঁ! উঠবার চেষ্টা করবেন না বিমলবাবু! কারণ আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। চেয়ে দেখুন দরজার গোড়াতেই থানা অফিসার রক্ষিত সাহেব দু'জন লাল পাগড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন ভালয় ভালয় আলো দুটি বের করুন, যেটা original, বরাবর আপনার জ্যাঠার ঘরে টেবিলে থাকত এবং

the other one যেটা মৃত্যুর দিন কোন এক সময় কৌশলে replace করেছিলেন, আপনার নিজস্ব সম্পত্তি!—'

ব্যাপারটা যেন কতই কৌতুকের এমনিভাবে লঘু হাস্যে বিমল বলে ওঠেঃ চমৎকার গল্প ফাঁদতে পারেন ত আপনি রায় মশাই।

'গল্পই। তবে সে মারাত্মক গল্পের উপসংহারে আপনি হবেন লৌহবলয়-মণ্ডিত ফাঁসির আসামী—'

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে কিরীটি জবাব দেয়।

তথাপি মুহূর্তে লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে বিমল, কিন্তু কিরীটির অতর্কিত যুযুৎসুর প্যাঁচে পড়ে গতিহারা হয়।

সত্যিই দোকানের মালপত্রের মধ্যেই দু'টি একই ধরণের টেবিল ল্যাম্প পাওয়া গেল। সত্যিকারের মেকানিক বিমলচন্দ্র। টেবিল ল্যাম্পটির সুইচ্ প্রেস্ বটনের মত সেটিকে খুলে ফেলে সেই সুইচেরই অনুরূপ হাইপোডারমিক্ নিডিল সংযুক্ত একটি প্রেস্ বটন তৈরী করে তার নিচের অংশে একটি বিষ ভর্ত্তি রবার ক্যাপসুল জুড়ে দিয়ে আলোর সুইচের জায়গায় লাগিয়ে প্রিয়নাথকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ব্যবস্থা হয়েছিল। অপূর্ব্ব পরিকল্পনা। অর্থাৎ যেই প্রিয়নাথ শয়নের পূর্ব্বে নিত্যকার অভ্যাস মত প্রেস্ বটন টিপে আলোটি জ্বালতে যাবেন সেই মুহূর্তে প্রেস্ বটনের মধ্যস্থিত নিডিলের অগ্রভাগ আঙুলে বিদ্ধ হবে ও সেই সঙ্গে চাপ লেগে বটনের নীচে সংগুপ্ত রাবার ক্যাপসুলের

ভিতর হ'তে মারাত্মক বিষ শরীরে সংক্রামিত হবে। পিন্ বিদ্ধ হবার জন্য আঙুলে সামান্য একটু জ্বালা প্রথমটায় টের পাওয়া যাবে মাত্র, তার চাইতে বেশী কিছু নয়। এদিকে ক্রমে ভয়ংকর বিষ Curare শরীরের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার দরুণ ধীরে ধীরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শরীরের যাবতীয় মোটর নার্ভের কেন্দ্রগুলো বিষের প্রক্রিয়ায় ঝিমিয়ে আসবে, অথচ চিৎকার করবার বা উঠবার শক্তিও লোপ পাবে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসবে অবধারিত মৃত্যু!

আলোর সব মেকানিজম্ দেখিয়ে দিয়ে কিরীটি বলছিল : ঠিক ঐ ভাবে হত্যা করা হয়েছিল প্রিয়নাথকে। শয়নের পূর্বে রাত্রে যেটা জ্বেলে রেখে তিনি ঘুমাতেন—আর যেটা আপনি, তার পরে কিরীটি বলেছিল: নিত্যকারের মত সে রাত্রেও আলোটা জ্বালিয়েছিলেন বটে, তিনি কিন্তু শয্যায় গিয়ে শয়নের আর অবকাশ পাননি। চেয়ারের পরেই ধীরে ধীরে বিষের মারাত্মক ক্রিয়ায়, মরণের কোলে, ঢলে পড়েছেন। প্রথম হ'তে সরমা দেবীকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু তার চিঠি পাওয়ার পর বুঝলাম তিনি নন। তবে কে! তবে কি বিকাশই। সরমা দেবীর আকস্মিক অন্তর্ধানে সত্যিই প্রথমটায় আমি বড় বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলাম, নচেৎ যোগেশের মুখে প্রিয়নাথের ঘরের তালা ভাঙ্গবার সংবাদটা পাওয়ার পর সেইদিনই আর একবার ঘরটা পরীক্ষা করলেই প্রিয়নাথহত্যারহস্য উদ্ঘাটনে এত দেরী হতো না। হলোও তাই।

ঘরে ঢুকে তালা ভাঙবার উদ্দেশ্য খুঁজতে গিয়েই সত্য সূর্য্যের আলোর মতই আমার সামনে প্রকাশ পেল—যেই দেখলাম ঘরের টেবিলের পরে সেদিনকার টেবিল ল্যাম্পটি নেই এবং ল্যাম্পটা কেন চুরী গেল ভাবতে গিয়েই বিদ্যুৎ চমকের মত আর একটা সম্ভাবনা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল, প্রিয়নাথের ঘরে রাত্রে সরমা দেবীর গোপন অভিসারের কথা কেবলমাত্র বিকাশই নয়, আরো একজনও নিশ্চয়ই তাহ'লে জানত। এবং কে সে! কার পক্ষে আর এ বাড়িতে সে রহস্য জানা বেশী সম্ভব ছিল ভৃত্য যোগেশ ছাড়াও! কে! কে! জানা সম্ভব ছিল তারই পক্ষে বেশী যে প্রিয়নাথেরই পাশে ঘরেই শয়ন করতো। সে সরমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলেকট্রিসিয়ান বিমল! বিমলই যদি হয়, তাহলে—বিমল! ইলেকটিক মেকানিক। ইলেকটিক টেবিল ল্যাম্প। সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেলাম টেবিল ল্যাম্প চুরীর মীমাংসাও। হাঁ বিমলই—কিন্তু বিমলের ইলেকটিক ল্যাম্পটা চুরী করার সঙ্গে হত্যা-রহস্য জড়িয়ে আছে কি ভাবে! মনের মধ্যে তখন আমার অত্যন্ত দ্রুত একটার পর একটা সম্ভাবনা এসে উঁকি দিচ্ছে—মনে পড়লো মৃতদেহের ডান হাতের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে ছোট্ট রক্ত বিন্দুটি। ব্যস্ মিলে গেল দু'য়ে দু'য়ে চার। ঐ আলোর মধ্যেই ছিল মৃত্যু ফাঁদ এবং সেই আলো জ্বালাতে গিয়েই ঘটেচে মৃত্যু! আর দেরী না করে তখনই ছুটলাম বিমলের দোকানে। —একটু থেমে কিরীটি বাকীটুকু বলে: হত্যার মোটিভ্ সম্পর্কে আগেই আমরা জেনেছি, প্রিয়নাথ ও সরমার মধ্যে অনভিপ্রেত

অসামাজিক প্রেম—রাতের পর রাত তাদের গোপন অভিসার পুত্র বিমলকে মরীয়া করে তুলেছে। যার ফলে সে প্রিয়নাথকেই হত্যার সংকল্প করেছিল।

হত্যার যে পরিকল্পনাটি সে করেছিল, পূর্বেই বলেছি সেটা অপূর্ব। বিকাশকে প্রশ্ন করেই বোধ হয় সে Curare বিষের ক্রিয়া জেনে নেয়। কারণ বিকাশ গত কিছুদিন ধরে ঐ মারাত্মক বিষটি নিয়ে রিসার্চ করছিল জানা গিয়েছে। হত্যার পরিকল্পনার পর হয়ত স্বাভাবিক মানুষের পাপ হ'তে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার বৃত্তিতেই, বিকাশের ঘাড়ে হত্যাপরাধটা চাপাবার জন্য, তার ল্যাবরেটারীর টেবিলের ড্রয়ারে তার অজ্ঞাতে কোন এক সময় যখন বিষ সংগ্রহ করে তখুনি একটা সিরিঞ্জ রেখে এসেছিল হত্যাকারী এবং মনে মনে হয়ত এও ভেবেছিল : ঐ ভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা একমাত্র সায়েন্সের স্টুডেণ্ট তার পক্ষে ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না এবং পুলিশেরও ধারণা তাই হবে। কিন্তু পাপ পুণ্য ধর্মাধর্মের যিনি বিচারকর্তা—যাঁর চোখে কিছুই এড়ায় না, যাঁর বিচারের খাতায় প্রতিটি হিসাব নিকাশ অতি সূক্ষ্ম; তিনিই হত্যার পর বিমলকে দিয়ে আমায় ফোন করিয়েছিলেন। নিজের পরে আত্মবিশ্বাসের দম্ভে যে কৌতুক সে করতে গিয়েছিল আমাকে ফোন করে—সেটাই হলো তার পক্ষে মৃত্যু শর। মৃত্যু-শর তারই বুকে ফিরে এলো কৌতুক হ'য়ে নয়, চরম আঘাত নিয়ে। অবশ্য এও আমার অনুমান টেলিফোনের ব্যাপারটা।—' তবু একটা কথা বলবো। কেন যে সে ফোন

করেছিল সেইটাই আজও দুর্বোধ্য লাগে আমার কাছে। মানুষের মন যে কত বিচিত্র ঐ সঙ্গে তাও মনে হয়।

'অনুমান ?—' তবু সলিল প্রশ্ন করে।

'হাঁ। ভুলে যাও কেন ঐ অনুমানের উপরেই যে আমাদের তদন্তের সমস্ত বাহাদুরীটা দাঁড়িয়ে আছে। Guess and intelligent guess! এবং সেই অনুমানের পরে ভিত্তি করেই ত মৃতের ঘরের মেঝেয় দু' ফোঁটা রক্ত সরমা দেবীর দিকে আমায় চালিত করে। দু' ফোঁটা রক্তই সত্যকে করলে উদ্ঘাটিত। দুঃখ হয় কেবল হতভাগিনী সরমা দেবীর জন্য। যে বুক-ভরা আগুন নিয়ে তিনি পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন, শুধু শেষ প্রার্থনা জানাই সেই তাঁরই কাছে—ক্ষমার দেবতা তাকে যেন ক্ষমা করেন।—'

কিরীটি চুপ করলো।

॥ ৫ ॥

—ক—

কিরীটির কথা

ডাক্তার সেনের চেম্বারে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

রাত প্রায় পৌনে আটটা হবে। চেম্বারের কাজ-কর্ম শেষ হ'য়ে গিয়েছে, উঠবো উঠবো করে রিভলভিং চেয়ারটার 'পরে গা এলিয়ে সবে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে গোটা দুই টান দিয়েছে ডাক্তার।

এমন সময় দরজার গায়ে টুক্ টুক্ মৃদু নক্ পড়লো।

'ইয়েস্, কাম ইন্—' ডাঃ সেন বললে।

যিনি পর-মুহূর্তে সুইং-ডোর ঠেলে চেম্বারে প্রবেশ করলেন, তিনি ২৪।২৫ বছরের একটি মহিলা। পরিধানে সাধারণ একখানি মিলের শাড়ী ও গায়ে শাদা এমব্রয়ডরী-করা ব্লাউজ, বাঁ হাতে দু'গাছি করে সোনার চুড়ি এবং ডান হাতের মণিবন্ধে রিষ্টওয়াচ। ঐ সামান্য বেশভূষাতেও মেয়েটিকে অপরূপ দেখাচ্ছিল।

শুধু যে সুন্দরী তাই নন, অপূর্ব একটা আভিজাত্য যেন সর্বদেহে। চোখ-মুখে একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা। কিন্তু নিখুঁত মুখখানির নিম্নোষ্ঠের ঠিক ডান দিকে চন্দ্রের কলঙ্কের মতই ছোট্ট একটুকরো গোলাকার ক্রিম রংয়ের এ্যাডহিসিভ প্লাষ্টার আঁটা দেখলাম।

'নমস্কার !—' দুটি হাত তুলে নমস্কার জানানর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হলো, 'আপনিই ত ডাঃ সেন ?'

'হাঁ, বসুন !—' ইংগিতে সামনের চেয়ারটায় বসতে আহ্বান জানাল ডাঃ।

দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে বসতে বসতেই মহিলাটি একেবারে সোজাসুজি কাজের কথা পাড়লেন, 'আমার কিছু Private talks ছিল আপনার সঙ্গে ডাঃ—'

সেন আমার দিকে তাকাবার আগেই আমি চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে কাচের আধা পার্টিশন দেওয়া রোগী পরীক্ষার ঘরে গিয়ে বসলাম। পাশের ঘরের সব কথাই কানে আসছিল এবং দেখতেও পাচ্ছিলাম সবই। মেয়েটি বলছিল, 'ডাঃ আমি একবার আপনাকে দিয়ে আমাকে থরো এক্‌জামিন করাতে চাই।'

ডাঃ প্রশ্ন করল, 'কি আপনার কমপ্লেন বলুন ?'

'আপনি আমাকে এক্‌জামিন করে বলুন শরীরে আমার কোন খারাপ রোগ I meau বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই—' সোজাসুজি মহিলা বললেন।

'কোন প্রকার Exposureয়ের কোন history আছে কি ?—'

'আগে আপনি আমাকে পরীক্ষা করে বলুন, তার পর বলছি।—'

আগন্তুক মহিলার ঐ কথার পর কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডাঃ সেন। কথায় বার্তায় মনে হয় ভদ্রমহিলা শিক্ষিত, এবং বুদ্ধিমতী। ওর মুখের দিকে চেয়ে

থাকতে থাকতে সমস্ত দৃষ্টি ডাক্তারের যেন ঠোঁটের কোণে আঁটা এ্যাডহিসিভ প্ল্যাস্টারের টুক্‌রোটির 'পরে ঘনীভূত হলো। প্রশ্ন করল, 'আপনার ঠোঁটের নীচে কি হয়েছে?'

'ছোট্ট একটা ফুঁসকুড়ি মত হয়েছিল সেটা গলে গিয়ে ঘা হয়েছে কয়েকদিন হলো।—'

'কোন ব্যথা আছে কি ওখানে?—'

'না, কোন ব্যথা বা জ্বালা নেই!—'

'প্লাষ্টারটা তুলুন তো দেখি!—'

দু' আঙ্গুল দিয়ে প্লাষ্টারটা তুলে ফেললেন। একের-চার ইঞ্চি পরিমাণ ছোট্ট একটি ক্ষত। ভাল করে পরীক্ষা করতেই সমস্ত সন্দেহের অবসান হলো ডাক্তারের। এ্যানটিসেফটিক্‌ লোশনে হাত ধুয়ে ডাক্তার আবার চেয়ারে এসে বসল।

'যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি করেন—?'

'ষ্টুডেণ্ট। পোষ্ট গ্রাজুয়েট।—'

'আপনার নাম?—'

'অনিলা দাশ!—'

মিস্‌ দাশ আবার ডাক্তারকে অনুরোধ জানালেন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য।

'আপনাকে এক্ষুণি আর পরীক্ষা করবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না মিস্‌ দাশ! আগে আপনি, একটা ঠিকানা দিচ্ছি আপনাকে, আপনার রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে আসুন সেখান হতে, তারপর আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি দেবো।—

'কেন! আপনার কি মনে হয় কোন প্রকার খারাপ রোগ সত্যিই হ'য়েছে আমার ?—'

'রক্তটা পরীক্ষা হোক, তারপর বলবো!—'

'কোন কিছু সন্দেহ করছেন কি ? বলুন না ? কিন্তু করছেন কেন ডক্টর সেন ?—'

মিস্ দাশের ব্যগ্রতা দেখে মৃদু হেসে ডাঃ বললে, 'ডাক্তারের মন ত সর্বদাই সন্দিগ্ধ! সব কিছুতেই তারা সন্দেহ করে!—'

'না। তবু আপনি কি অনুমান করছেন বলুন। আমি শুনতে চাই!—'

'অনুমানের প'রে কিছু আমি মতামত দিতে পারবো না। ক্ষমা করবেন!—' কতকটা দৃঢ়তার সঙ্গেই ডাঃ জবাব দিল।

অতঃপর ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তার পর মৃদু কণ্ঠে বললেন: দেখুন, আপনার diagnosisয়ের উপরেই আমার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে ডাঃ সেন। আপনাকে তাহ'লে সব কিছু খুলেই বলি। এম, এ পড়ছি আমি। আমার সহপাঠী সুধাংশু—তার সঙ্গে আমার পরিচয় গত আট বছর থেকে। এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে বাগদত্ত। কথা ছিল, আমার মা-বাবার অমতেই সামনের ১০ই অগ্রহায়ণ রেজিষ্ট্রি মতে আমাদের বিবাহ হবে। কিন্তু—' মিস্ দাশ ইতঃস্তত করতে লাগলেন।

কাচের পার্টিশনের এপাশ থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ডাক্তার নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিস্ দাশ কিছুক্ষণের জন্য নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেন নিজেকে সামলে নিলেন।

'কিন্তু হঠাৎ সে আমার প্রতি এক নিদারুন অভিযোগ এনেছে। অভিযোগ এনেছে আমার চরিত্রের 'পরে—কিন্তু আপনাকে আমি বলতে পারি সুধাংশু ছাড়া জীবনে আমার কোন দ্বিতীয় পুরুষ আসে নি।—'

'তবে তিনি সন্দেহ করছেন কেন?—কোন কারণ আছে কি?—'

'সৌরীন ওর বন্ধু! ছেলেবেলার বন্ধু! জমিদারের ছেলে মস্ত বড় ধনী। গত বৎসর কলেজের এক স্থোশাল্ ফাংশনে সুধাই আমাকে সৌরীনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। সৌরীন তারপর হতেই মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে আসতে সুরু করে। মা-বাবার ইচ্ছা সৌরীনকেই আমি বিবাহ করি। যদি কোন কারণ থাকে ত একমাত্র ঐ কারণই থাকতে পারে। কিন্তু তাই বা হবে কেন? এই আট বছরেও কি ও আমাকে চিনতে পারেনি?—'

'দেখুন মিস্ দাশ! আপনার ও-কথার কি জবাব দেবো? সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ব্যাপার।—'

'আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু আছে। দিন তিনেক আগে সেই হঠাৎ আমার ঠোঁটের কোণের ঐ ঘা'টা দেখে বলে, ওটা নাকি খারাপ ঘা। সেই নিয়েই আমাদের দু'জনের মধ্যে বচসা হয় গত কাল। আপনারও কি তাই মনে হয়?—'

এর পর ডাঃ সেনকে উঠ্‌লো এবং ঘা'টা আবার পরীক্ষা করে বলল,—'আমি দুঃখিত মিস্ দাশ—ঘা'টা ভাল বলে মনে হচ্ছে না। যাহোক, আপনি আগে রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে আসুন।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই ডাঃ রের চেম্বারের সুইং-ডোরটা ঠেলে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই একটি সুশ্রী যুবক ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে বলে উঠলো, 'খুব ত সাফাই গাইছিলে উঁচু গলায় এতক্ষণ! এবারে! আমি জানি সৌরীনের ঐ রোগ ছিল—।'

'কে আপনি, হঠাৎ না পারমিশন নিয়ে আমার চেম্বারে ঢুকেছেন কেন? সাধারণ ভদ্রতাটুকুও জানেন না?—' বেশ রুক্ষ কণ্ঠেই ডাঃ বললে যুবককে।

'I am sory!—' বলে যুবকটি কক্ষ হ'তে বেরিয়ে গেল।

মিস্ দাশ যেন একেবারে নিষ্প্রাণ পাথরে পরিণত হয়েছেন। অনুমানেই বুঝলাম যুবকটি কে। ডাঃ সেন প্রশ্ন করল মিস্ দাশকে, উনি কে?

'সুধাংশু!—' নিম্ন কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্ দাশ। একটু থেমে, বললেন 'আমাকে তাহ'লে addressটা দিন যেখানে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে।'

ঠিকানাটা একটা স্লিপ কাগজে ডাঃ সেন লিখে দিল। মিস্ দাশ অতঃপর ফিস্ দিয়ে নমস্কার জানিয়ে কক্ষ হ'তে বের হ'য়ে গেলেন।

দিন দুই বাদে সকাল বেলা ঐ দিনকার সংবাদপত্রটার পাত

উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ একটা ছবির 'পরে চোখ পড়তেই চম্‌কে উঠলাম। আশ্চর্য! এ মুখখানা যেন আমার বেশ চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি! পর-মুহূর্তেই ছবির নীচে সংবাদটা পড়তেই যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। পরশু সন্ধ্যায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঐ যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। যুবকটি আর কেউ নয়, দিন দুই পূর্বে ডাঃ সেনের চেম্বারের মধ্যে যে বিনানুমতিতে অকস্মাৎ প্রবেশ করেছিল সেই: সুধাংশু চৌধুরী।

সংবাদে প্রকাশ: গত ৩রা কার্তিক অর্থাৎ ঠিক যে সন্ধ্যায় যুবকটির সঙ্গে আমার ডাঃ সেনের চেম্বারে দেখা হয়েছিল। সেই দিনই শেষ রাত্রে পার্কের মালী যুবকটির মৃতদেহ একটি বেঞ্চের 'পরে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখে পুলিশকে সংবাদ দেয়। পুলিশ এসে তদন্ত করে মৃতদেহ মর্গে প্রেরণ করে। মালীর জবানবন্দী থেকে জানা যায়, ঐ রাত্রে প্রায় গোটা নয়েকের সময় নাকি মালী ঐ যুবক ও একটি যুবতীকে অনুচ্চ স্বরে তর্ক করতে করতে স্কোয়ারে প্রবেশ করতে দেখে। তারপর আর সে কিছু জানে না। যুবকটির জামার পকেট অনুসন্ধান করে পুলিশ একটা চামড়ার পার্শ পায়—তার মধ্যে আট টাকা দশ আনা মত ছিল, একটি পার্কার ফাউন্টেন পেন, একটি মুখ-আঁটা খামের চিঠি পায়। খামের উপর একটি মেয়ের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যুবকটি পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। এবং তার পকেটে মুখ-আঁটা খামে যে উপরে নাম-ঠিকানা লেখা চিঠিটা পাওয়া যায়, সেই ঠিকানা অনুযায়ী সন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়—সেই

মেয়েটি ঐ সুধাংশু চৌধুরীর বিশেষ পরিচিত ও সহপাঠিনী। মেয়েটি তার জবানবন্দীতে বলে আগের দিন রাত্রে প্রায় গোটা নয়েকের সময় সে ও সুধাংশু ঐ স্কোয়ারের মধ্যে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে এবং কোন ব্যাপার নিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হয়। এবং চটাচটি পর্যন্ত হয়ে যায়। রাত গোটা এগার নাগাদ মেয়েটি রাগারাগি করে স্কোয়ার হ'তে বের হ'য়ে সোজা বাড়ী ফিরে আসে। এর বেশী সে কিছু জানে না। মেয়েটি পুলিশের নজরবন্দী হ'য়ে আছে বর্তমানে।

সংবাদটা পড়ে মনে হলো কে মেয়েটি! অনিলা দাশ মেজর দাশের মেয়ে নয় ত! কেমন কৌতূহল হলো। তখুনি ছুট্‌লাম মেজর দাসের ওখানে, তারপর সেখান থেকে ছুট্‌লাম ডাঃ সেনের বাসায়। ডাক্তারের তখন হাসপাতাল যাবার সময় হ'য়ে গিয়েছে, ধড়াচুড়া পরে প্রস্তুত হয়েছে হাসপাতালে যাবার জন্যে। গাড়ীতে উঠতে যাবে, এমন সময় আমার গাড়ী ঠিক দরজার সামনে ব্রেক কষল।

ডাক্তারের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।

'ব্যাপার কি! রহস্যভেদী যে হঠাৎ! এই সকালেই'! ডাঃ সেন প্রশ্ন করে।

'বিশেষ একটা কারণেই আসতে হলো!—'

'কিন্তু আমি যে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম।—'

'দু'-চার মিনিটের বেশী সময় নেবো না।—' গাড়ী হতে নামতে নামতে আমি বললাম।

দু'জনে বাইরে ঘরে এসে বসলাম।

ডাক্তার বললে, 'কি খবর বল' ?

আমি তখন জামার বুক-পকেট হ'তে একটা ভাঁজ-করা কাগজ তার চোখের সামনে মেলে ধরলাম 'দেখ ত ডাঃ, তোমার চেম্বারের স্লিপ, না ?—'

'হাঁ! এ সেই স্লিপটা যেটা অনিলা দাশকে দিয়েছিলাম প্যাথলজিষ্ট ডাঃ দত্তর ঠিকানা লিখে। কিন্তু তুমি কোথায় পেলে কিরীটি ?

আমি তখন বললাম, বলছি শোন !

মেজর দাশ আর্মীর একজন রিটায়ার্ড মেডিকেল অফিসার। অনিলা তাঁরই বড় মেয়ে, ইউনিভারসিটিতে ইংলিশে এম. এ পড়ছিল। মেজর দাশ আমার পরিচিত। ১৭ই ভোর রাত্রে অনিলার বিশেষ পরিচিত—সহপাঠী সুধাংশু চৌধুরী নামে এক যুবকের মৃতদেহ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পাওয়া যায় আজকের সংবাদপত্রে দেখেছো কিনা জানিনা। সুধাংশুর পকেটে একটা চিঠি ছিল অনিলার নামে, সেই ঠিকানা trace করে পুলিশ অনিলাদের ওখানে যায়। Do you follow me !—'

'হুঁ! বল।—'

'অনিলা তার জবাবন্দীতে বলেছে পুলিশের কাছে, ঐ রাত্রে অর্থাৎ যে রাত্রে সুধাংশু নিহত হয়, নয়টা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত নাকি তারা দু'জনে পার্কে ছিল। কোন ব্যাপার নিয়ে

উভয়ের মধ্যে বচসা ও রাগারাগি হয় (বচসার কারণ অনিলা বলতে নারাজ) যার ফলে অনিলা রাগ করে বাড়ী চলে আসে।'

'হাঁ! হাঁ মনে পড়ছে বটে আজকের সংবাদপত্রেই সকাল বেলা সংবাদটা পড়েছি। পুলিশ অনিলাকে সন্দেহক্রমে নজরবন্দী করে রেখেছে, তাই না?—'

'হাঁ!—'

'গত কাল রাত্রে অনিলার personal belongings পরীক্ষা করতে করতে ঐ slipটা পেয়েছি, তাই সকালেই ছুটে এসেছি ব্যাপারটা verify করতে। যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।—'

কিরীটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তার পর বললে, 'তোমার কি মনে হয় ডাক্তার? ক্ষতটা—'

'হাঁ, সিফিলিস্ বলেই মনে হয়। রক্ত পরীক্ষা ত হয়নি?—'

'না!—'

'কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশ অনিলাকেই বা সন্দেহ করছে কেন?—'

'তার কারণ মৃতদেহের গলার ডান দিকে একটা চুলের কাঁটার প্রায় ৩/৪ অংশ বিদ্ধ হ'য়ে ছিল।—'

'তার মানে?—' বিস্মিত ডাঃ আবার প্রশ্ন করে।

'অনিলা খোঁপায় যে ধরণের কাঁটা ব্যবহার করে মৃতদেহের গলায় বিদ্ধ কাঁটাটাও ঠিক একই রকমের। শক্ত ষ্টিলের কাঁটা। আগাটা ছুঁচালো এবং মাথায় মুক্তো বসান। ইনেসপেকটার

সলিল সেনের অভিমত হচ্ছে, ঐ কাঁটা বিঁধিয়েই নাকি সুধাংশুকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর কারণ ঐ চুলের কাঁটাটিই !—'

'Nonsense ! গলায় একটা চুলের কাঁটা বিঁধোলেই অমন করে কাউকে মারা যায় নাকি ?—'

'যায় কি না যায়—ডাক্তার তোমরাই বলতে পারো। তবে আপাততঃ ময়না তদন্তে ঐটাই মৃত্যুর কারণ বলে ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করেছে !—'

'বিশ্বাস করি না !—'

'আমিও একমাত্র সেইটুকুর 'পরে নির্ভর করেই মেজর দাশকে আশ্বাস দিয়েছি। আচ্ছা ডাক্তার, এবারে উঠি ! আবার হয়ত বিরক্ত করতে আসতে পারি !—'

'একশ বার আসবে। তাছাড়া আমিও এ ব্যাপারটায় interested বোধ করছি !—'

খ

সুব্রতর কথা

সুধাংশু চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারটা সত্যিই বড় জটিল। শ্রীমতী অনিলা বুঝতে পারছি নির্দোষ কিন্তু তাকে বাঁচাবার কোন উপায়ই দেখছি না। মুখ সে খুলবে না স্থির প্রতিজ্ঞ একেবারে। সে রাত্রে পার্কে সুধাংশুর সঙ্গে তার যে কি কথা হয়েছে তাও সে বলবে না।

কিরীটি তার বাড়ির দোতলার ঘরে সোফার 'পরে বসে সামনে একটা ত্রি'পয়ের পরে তাস বিছিয়ে খেলছে। আপাততঃ তার মাথার মধ্যে কোনরূপ চিন্তা আছে বলেই মনে হয় না। একটু আগে সলিল সেন এসেছিল, সে অনিলাকে গ্রেপ্তার করতে চায়—মিথ্যে আর দেরী করে সময় নষ্ট করতে সে রাজী নয়, কিন্তু কিরীটি বাধা দিয়েছে, আর দু'টো দিন সবুর করো সেন! তার পর যা তোমার মন চায়, করো।—

সেন আপাততঃ বিদায় নিলেও অনিলা সম্পর্কে মন যে সে একপ্রকার স্থির করেই ফেলেছে, অন্তত তার কথায়-বার্তায় সেটা বুঝতে আমার বাকী নেই। কিন্তু এও বুঝতে পারছি কিরীটি যখন সেনকে দু'টো দিন আরো অপেক্ষা করতে বলেছে, মনের মধ্যে তার নিশ্চয়ই ঐ সম্পর্কে কোন একটা সংশয়ের বিতর্ক চলেছে। যে সংশয়ের মীমাংসায় না পৌঁছান পর্যন্ত সে কোন একটা চরম কিছু ঘটতে দিতে রাজী নয়।

সেদিন সমস্ত দুপুরটাই কিরীটি তাস নিয়ে পেসেন্স খেলে কাটিয়ে দিল।

বিকালের দিকে রৌদ্র যখন পড়ে এসেছে হঠাৎ কিরীটি উঠে পড়ল: চল সু, একটু বাইরের খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসা যাক।

বললাম: বেশ ত, চল।

আমার গাড়িই কিরীটির দোরগোড়ায় পার্ক করা ছিল, দু'জনে উঠে বসলাম।

'কোন্ দিকে যাবো?—' ষ্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে প্রশ্ন করলাম।

'ওয়েলিংটন স্কোয়ার!—'

গাড়ি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসতেই কিরীটির নির্দেশ মত দু'জনে গাড়ি হ'তে নামলাম। অত্যাসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় চারিদিক তখন বিষণ্ণ বিধুর।

দু'জনে পার্কের মধ্যে প্রবেশ করে ঘুরতে ঘুরতে পার্কের মালীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কিরীটি মালীকে একটা নগদ করকরে টাকা বকশীস্ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ আলাপ জমিয়ে নিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মালীর কাছ হ'তে সে রাত্রের সুধাংশু ও অনিলা সম্পর্কে বিশেষ কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করা গেল না।

'কোন্ বেঞ্চে সুধাংশুর মৃতদেহ পরের দিন সকালে পাওয়া গিয়েছিল মালী?—'

মালী আমাদের নিয়ে গিয়ে বেঞ্চটা দেখিয়ে দিল।

মালীকে বিদায় দিয়ে আমরা পাশাপাশি সেই বেঞ্চের 'পরে বসলাম। পার্কে ঐ সময়টা বিশেষ কোন লোকজনের ভিড় ছিল না। রাস্তায় অবশ্য জনপ্রবাহ, ট্রাম, বাস, রিক্সা ও ট্যাক্সী গাড়ির অবিরাম শব্দতরঙ্গ একটানা চলেছে।

মাত্র চার রাত্রি আগে এই বেঞ্চের 'পরে বসেই একটি তরুণের জীবনের 'পরে মৃত্যুর করাল স্পর্শ নেমে এসেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে কে তার পাশে ছিল কে জানে? অনিলা

কি সত্যই ছিল না? না, সে মিথ্যে কথা বলছে? কিন্তু কেনই বা মিথ্যা বলবে সে? সুধাংশুকে ত সে ভালবাসত? এবং সত্যিই যদি সে সুধাংশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী না হ'য়ে থাকে, তবে এ ভাবে তার ভালবাসার জনের হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করছেই বা না কেন?

হঠাৎ কিরীটির প্রশ্নে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল। চেয়ে দেখি, কিরীটির প্রসারিত হাতের পাতার 'পরে কয়েকটি ছোট ছোট কাচের টুকরো, 'এগুলো কি বল ত সু?'

'কাচের টুক্‌রো দেখছি! কোথায় পেলি?—'

'এই বেঞ্চের সামনে ঘাসের মধ্যে!—' কিরীটি কাচের টুক্‌রো-গুলো দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক ভাবে বললে, 'কিন্তু কিসের কাচের টুক্‌রো বলে মনে হয়?'

হাতে একটা টুক্‌রো তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললাম, 'কোন পাতলা—'

'হাঁ। কাচের এ্যাম্‌পুলের টুক্‌রো। কোন ইন্‌জেকশনের এ্যাম্‌পুল ভাঙ্গা বলেই মনে হচ্ছে—তাই না।—'

ইতিমধ্যে চারিদিকে সন্ধ্যার ধূসর অস্পষ্টতা আরো একটু ঘন হ'য়ে এসেছে। রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে।

'তোর কাছে টর্চ আছে?—' কিরীটি আবার প্রশ্ন করে।

পকেটে পেনসিল টর্চটা ছিল, সেটা বের করে দিলাম। কিরীটি সেই টর্চের আলোয় বেঞ্চের সামনে ঘাসগুলো আরো

পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। আরো অনুরূপ কয়েকটা এ্যাম্পুল ভাঙ্গা কাচের টুকরো পাওয়া গেল।

স্কোয়ার থেকে বের হ'য়ে আমরা সোজা সুধাংশু যে হষ্টেলে থাকত মেছুয়াবাজারে সেই হষ্টেলে গিয়ে হাজির হলাম।

সুধাংশুর রুম-মেট্ সন্তোষ দিন সাতেকের জন্য বাড়ি গিয়েছিল, তাই কিরীটি তার সঙ্গে ইতিপূর্বে দেখা করতে এসে দেখা পায়নি। চাকরের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঐ দিন ঘণ্টাখানেক আগে সে নাকি ফিরেছে।

চাকরকে দিয়ে কিরীটি সংবাদ পাঠাতেই অল্পক্ষণের মধ্যে সন্তোষ নিজে এসে আমাদের উপরে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে বসাল, 'বসুন মিঃ রায়!'

সু ধাংশু যে রাত্রে মারা যায় সেই দিনই সন্ধ্যায় সন্তোষ বাড়ি যায়। সংবাদপত্রেই সে সমস্ত সংবাদ পেয়েছে।

পুলিশে সুধাংশুর মৃত্যুর ব্যাপারে অনিলা'কে সন্দেহ করছে শুনে সন্তোষ বললেঃ এ হতেই পারে না মিঃ রায়। ওদের পরস্পরের পরিচয় দীর্ঘ দিনের, তাছাড়া আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম পরস্পর ওরা পরস্পরকে কতখানি ভালবাসত। তাছাড়া বছর খানেক ধরে সুধা অসুখে ভুগছিল বলে অনিলার কি দুশ্চিন্তা—

'অসুখ। কি অসুখে ভুগছিল?—'

'হার্টের অসুখ। ঐ যে কি বলে এ্যনজাইনা পেকটোরিস্ না কি?—'

'এ্যনজাইনা পেকটোরিস্?—'

'হাঁ!—'

'কোন চিকিৎসা করায়নি?—'

'লালমোহন বলত এর আর চিকিৎসা কি? কি একটা ঔষধ কাছে সর্বদা রাখতে বলেছিল, এ্যাটাকের সম্ভাবনা হলেই সেই ওষুধ নাকে শুকবার জন্য বলে দিয়েছিল। অনেকটা ইনজেকশনের এ্যাম্পুলের মত ভেঙ্গে শুকতে হতো। ওষুধ সর্বদাই ওর কাছে থাকত!—'

'লালমোহন কে?—'

'লালমোহন ঘোষ আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু! গত বছর বিলাত থেকে এসেছে। পার্ক সার্কাসে প্র্যাকটিস্ করে!—'

'কি ওষুধ, আপনি জানেন না?—'

'না। লালমোহন বলতে পারবে। আমি ত এখুনি লাল-মোহনের ওখানেই যাচ্ছিলাম। চলুন আমার সঙ্গে তাকে না জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবেন!—'

ডাঃ লালমোহন ঘোষ এম, আর, সি, পি, উদীয়মান তরুণ চিকিৎসক। সে সময় তার চেম্বারে কোন ভিড় ছিল না আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

কিরীটির পরিচয় পেয়ে আরো সুখী হলেন। কিরীটির

প্রশ্নোত্তরে বললেন : সাধারণত যদিও সুধাংশুর ঐ বয়সে এ্যন-জাইনা পেকটোরিস্ হয় না, তাহলেও ওর হয়েছিল। ওকে 'এমিল নাইট্রেট ক্যাপস্থুল' সর্বদা কাছে রাখবার জন্য আমিই উপদেশ দিয়েছিলাম যাতে হঠাৎ কখনো attack হলেই বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে ঐ এ্যামপুল ভেঙ্গে তার গন্ধ নাকে শুঁকে।

কিরীটি পকেট হ'তে কাগজের মোড়কে সেই স্কোয়ার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ভাঙ্গা কাচের টুক্‌রোগুলো ডাঃ ঘোষের সামনে মেলে ধরে বললে : দেখুন ত ডাঃ ঘোষ, এগুলো কিসের ভাঙ্গা টুকরো ?

ডাঃ ঘোষ পরীক্ষা করে বললেন, 'এ ত কোন এ্যামপুল ভাঙ্গা মনে হচ্ছে।'

সে রাত্রে বাড়িতে ফিরে কিরীটি অনেকক্ষণ ব্রিটিশ ফার্মো-কোপিয়ার বই নিয়ে বসে পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক সময় আমাকে ডেকে বললে, 'শোন্ সু! এ্যমিল নাইট্রেট সম্বন্ধে লিখছে : এ্যমিল নাইট্রেট রক্তের হিমোগ্লোবিনকে মিথ-হিমো-গ্লোবিনও নাইট্রিক অক্সাইড হিমোগ্লোবিনে পরিণত করে এবং arterial bloodকে venous bloodয়ে পরিণত করে। যে পরিণতির ফলে রক্ত-কণিকার অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা বাধা প্রাপ্ত হয়। সাধারণ ডোজে ক্ষতি হয় না কিন্তু বেশী ডোজে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। Now I have got the clue।

পেয়েছি। এখন বুঝতে পারছিস্ ত ঐ এ্যামিল নাইট্রেট্ বেশী পরিমাণ শুঁকিয়েই সুধাংশুর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে, তার পর অনিলার ঘাড়ে দোষ চাপানর জন্য তার চুলের একটি কাঁটা মৃতের গলায় বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই বন্ধু!—' বলতে বলতে কিরীটি উঠে পাশের ঘরে চলে গেল এবং শুনতে পেলাম পাশের ঘরে টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলেছে। টেলিফোনে প্রায় মিনিট পনের কুড়ি কার সঙ্গে কথা বলবার পর কিরীটি অবার ফিরে এলো। মুখখানা যেন আনন্দে তার ঝলমল করছে।

'কার সঙ্গে কথা বলছিলি?—'

'প্রথমে ডাঃ ঘোষ। তার পর সলিল সেনকে সব বললাম।'

'সলিল সেনকে? খুনের কিনারা করতে পেরেছিস্ নাকি?'

'হ্যাঁ। সলিল আসছে। এখুনি বেরুবো!—'

গ

সৌরীনের কথা

ভৃত্য এসে যখন সংবাদ দিল এত রাত্রে দু'জন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। অবাকই হয়েছিলান। হঠাৎ বিলাতের প্যাসেজটা পেয়ে গিয়েছি। আর দশ দিনের মধ্যে

বিলাত যাবো। কলকাতায় আর ভাল লাগছে না। কোন আকর্ষণই নেই। সমস্ত আশাই নির্মূল হয়েছে। সারাটা দিন সব কেনা-কেটা করে ক্লান্ত হয়ে শুতে, যাবো এমন সময় ভৃত্য রাম এসে সংবাদ দিল দু'জন ভদ্রলোক দেখা করতে চান, বিশেষ জরুরী।

বাইরের ঘরে তাদের বসাতে বলে স্লিপিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই নীচে নেমে এলাম।

ঘরে ঢুকতেই ওদের মধ্যে একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনিই মিঃ সৌরীন দত্ত!'

'হাঁ! কিন্তু আপনারা?'

'আপনাকে একবার কষ্ট করে এখুনি থানায় আসতে হবে আমার সঙ্গে—সেখানেই পরিচয়টা পাবেন।—'

'থানায়? কেন বলুন ত?'

'কারণ আপনি সুধাংশু চৌধুরীকে হত্যা করেছেন!—'

অবাকই হয়েছিলাম ভদ্রলোকের কথা শুনে। রাগও কম হয়নি। তাই বেশ রাগত কণ্ঠেই বললাম: জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনারা কে? এবং কেনই বা এ ভাবে মাঝরাত্রে এক জন ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে এ ধরণের ব্যবহার করছেন?

'আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনেস্‌পেকটার সলিল সেন।—' বলতে বলতে পকেট হ'তে ইনেস্‌পেকটার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করে কর্তব্য কঠিন কণ্ঠে বললেন,' স্বেচ্ছায় যাবেন না অন্য

ব্যবস্থা করতে হবে ? বাইরে আমার লোকেরা অপেক্ষায় আছে আমার আদেশের।'

'চমৎকার ব্যবস্থা! কিন্তু আপনাদের হাতে প্রমাণ কি আছে ?—'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক এবারে জবাব দিলেন, 'প্রমাণ! প্রথমতঃ আপনি সিফিলিস্ রোগে ভুগছেন এবং সেই রোগ দুরভিসন্ধি করে অনিলা দেবীর দেহে খুব সম্ভবত জোর করে চুম্বনের দ্বারা সংক্রামিত করে আপনার বন্ধু সুধাংশু বাবুর মন অনিলা দেবীর প্রতি বিরূপ করে তুলতে চেয়েছিলেন, তার মনে অনিলা দেবীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে—'

'How nice !—চমৎকার উপন্যাস। কিন্তু শোনেননি বোধ হয় অনিলা দেবী ও সুধাংশু দু'জনেই আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু !'

'হাঁ, বন্ধুত্বের চরম প্রতিদানই দিয়েছেন—'

'কিন্তু তাতে আমার লাভ কি ?—'

'লাভ, অনিলা দেবীর মত নারীরত্ন লাভের দুরাশায় !—কিন্তু আপনি আপনার খুনের motiveয়ের প্রমাণ চাইছিলেন না? প্রথম প্রমাণ দিয়েছি। দ্বিতীয় প্রমাণ—ডাঃ লালমোহন ঘোষের মুখেই আপনি শুনেছিলেন, এ্যামিল নাইট্রেট্ এমন মারাত্মক ঔষধ যে, বেশী পরিমাণে শুক্লে হঠাৎ মৃত্যু হ'তে পারে। তৃতীয় প্রমাণ—তাঁরই মানে ডাঃ ঘোষের কাছ থেকেই মাত্র দশ দিন আগে ফরিদপুরে আপনার অসুস্থ জ্যেঠামশাইকে পাঠাবেন

বলে দু' বাক্স এ্যামিল   ক্যাপ-সুলের প্রেসক্রিপসন করিয়ে আনেন। আরো প্রমাণ চান ?—'

'তা যদি করিয়েই এনে থাকি তাতেই কি প্রমাণ হ'য়ে গেল সুধাকে আমিই হত্যা করেছি ?—'

'আরো প্রমাণ আছে—সে রাত্রে অনিলা দেবী যখন স্কোয়ার থেকে বের হ'য়ে আসেন আপনাকে তিনি স্কোয়ারের সামনে আপনার গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিলেন। অত রাত্রে—'

কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেল। সহসা রাগে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। চেঁচিয়ে উঠি, 'মিথ্যা কথা। সে দেখতেই পারে না আমাকে।'

'কিন্তু তিনি হলফ করে বলেছেন!'

'Damn lie ! মিথ্যা ! সম্পূর্ণ মিথ্যা—'

'শুধু অনিলা দেবীই নয়—আপনার driverও বলেছে সে রাত্রে—'

'Impossible ! সে রাত্রে driver আমি মোটেই নিইনি সঙ্গে—নিজেই ড্রাইভ করেছি!—বেটাকে আমি খুন করবো।—'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না মিঃ [illegible], এখন ত বুঝতে পারছেন অতএব—'

কিন্তু!—'সে রাত্রে স্কোয়ারের সামনে যদি গিয়েই থাকি!—

'কিন্তু why ? কেন গিয়েছিলেন ? সেটাইত জানতে চাই ! হাওয়া খেতে নিশ্চয়ই নয়। কারণ হাওয়া খেতে হলে বালীগঞ্জ

থেকে গিয়ে ময়দান বা গঙ্গার ধারই প্রশস্ত ছিল। কি বলেন ?'
—বিশেষ করে আবার অত রাত্রে—'

'যেখানে খুসী আমরা হাওয়া খেতে যাবো! তাতে কার কি ?—'

—ঘ—

সুব্রতর শেষ কথা

শেষ পর্যন্ত সৌরীন দত্ত গ্রেপ্তার হ'য়েছে শুনে অনিলা দেবী কিরীটির কাছে মুখ খুললেন। নিজের রোগের লজ্জাতেই তিনি মুখ খুলতে চাননি। তাঁর কাছেই শোনা গেল সুধাংশুর মৃত্যুর পরই নাকি সৌরীন তাকে বিবাহের প্রস্তাব জানায়। এবং অনুসন্ধানের দ্বারা কেমিষ্ট মুখার্জী ব্রাদার্সের দোকান হ'তে সৌরীন দত্ত যে দু' বাক্স 'এ্যামিল নাইট্রেট ক্যাপসুল' কিনেছিলেন, হত্যার দিনই প্রত্যুষে সে প্রমাণও পাওয়া গেল। তা ছাড়া সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ পাওয়া গেল, ইদানিং কয়েক দিন যাবৎ সৌরীন প্রায় সর্বদাই সুধাংশুর সঙ্গে সঙ্গে থাকত এবং মৃত্যুর দিন ধর্মতলার মোড়ে স্কোয়ারের কাছে রাত নয়টার সময় সৌরীনের গাড়ি থেকেই সুধাংশু ও অনিলা একত্রে নেমে যায় একটা শেষ বোঝাপড়া করবার জন্য। সব কিছুই হয়ত অন্ধকারে আবৃত থাকত, কিন্তু

ক্যাপসুলের ভাঙ্গা টুক্‌রোগুলোই মৃত্যু-রহস্যের পথরেখা দিয়ে গেল কিরীটির তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তির কাছে।

পরে আমি কিরীটিকে বলেছিলাম, একান্ত ভাবে circumstantial evidenceয়ের উপরেই নির্ভর করে কিরীটি রহস্যের মীমাংসার শেষ ধাপে এগিয়ে গিয়েছিল অদ্ভুত একটা রিসক্ নিয়ে কারণ তা ভিন্ন তার আর গত্যন্তর ছিল না।

পারস্পরিক্ ঘটনাকে বিচার করে কিরীটি অনুমানের উপরেই নির্ভর করে সে রাত্রে ডাঃ ঘোষকে ফোন করে ইদানিং কারো সঙ্গে সুধাংশুর রোগ সম্পর্কে বা তার ব্যবহৃত ঔষধ সম্পর্কে তার কোন আলাপ-আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চায়।

তার জবাবে ডাঃ ঘোষ বলেন, ওদেরই এক বন্ধু সৌরীনের সঙ্গে মাত্র কয়েক দিন আগে ঐ সম্পর্কে নাকি আলোচনা হয়। তাছাড়া ইদানিং সৌরীন প্রায়ই সুধাংশু সম্পর্কে ডাক্তারের সঙ্গে নানা আলোচনা করত।

কিরীটি তখন প্রশ্ন করে, সৌরীন ইদানীং ডাক্তারের ওখানে ঘন ঘন আসত কেন? জবাবে ডাঃ ঘোষ বলেন, প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করে যে, চিকিৎসার জন্যই সে আসত তাঁর কাছে। কিসের চিকিৎসার জন্য সৌরীন তাঁর কাছে আসত জানবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালে তিনি বলেন—রোগীর secret যদিও বলা কর্তব্য নয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুলিশের ব্যাপার, তাই তিনি শেষ পর্য্যন্ত বলেন, সিফিলিস রোগে ভুগছিল সৌরীন, এবং ডাক্তার ঘোষ তার চিকিৎসা করছিলেন। ঐ কথা শুনে অকস্মাৎ কয়েক

দিন আগেকার ডাঃ সেনের কথা কিরীটির মনে পড়ে যায় এবং ডাঃ সেনের মুখে শোনা অনিলা কথিত কাহিনী ডাঃ ঘোষের কাহিনীর সঙ্গে দু'য়ে দু'য়ে চার যোগফল দেয়, বাকীটুকু সে তৈরী করে নেয় বিচার-বিশ্লেষণের ফরমুলায় ফেলে।

সৌরীনকে স্রেফ, চটিয়ে দিয়েই স্বীকারোক্তি করবার জন্য একটা কিরীটি চাল দিয়েছিল। সে রাত্রে সৌরীনকে অনিলা দেবী স্কোয়ারের সামনে তাকে দেখতে পান নিজে স্কোয়ার থেকে বের হয়ে যাবার সময়। সৌরীন ক্ষেপে ওঠে কথাটা শুনে, কারণ যদিও অনিলা তাকে না দেখে থাকে তথাপি এ কথাও সত্য যে, সে রাত্রে ন'টার সময় তারই গাড়ি থেকে নেমে যায় সুধাংশু ও অনিলা স্কোয়ারে কাছাকাছি ধর্মতলায়। অতএব পুলিশের সন্দেহ হওয়া স্বভোবিক সে রাত্রে যে, সুধাংশু ও অনিলার গতিবিধি সৌরীনের অজানা ছিল না সে রাত্রে। তারপর চুলের কাঁটা। সৌরীনই হয়ত কোন এক সুযোগে অনিলার মাথার খোঁপা থেকে খুলে নিয়েছিল একটা কাঁটা এবং সেটা মৃতের গলায় বসিয়ে দিয়ে অনিলার স্কন্ধেই সমস্ত দোষটা আরোপ করবার চেষ্টা পেয়েছিল হত্যাপরাধের।

অবশ্য পরে সৌরীনের স্বীকারোক্তিতেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

অনিলার নিকট হ'তে তার কামনা বার বার প্রত্যাখাত হ'য়ে নিষ্ঠুর জিঘাংসায় রূপায়িত হয়েছিল। —প্রত্যাখ্যানের প্রতিহিংসা।

একই নারীকে কেন্দ্র করে দুটি পুরুষের কামনা—এক জনের সমাপ্তি ঘটলো বিষ-প্রয়োগে অন্যের সমাপ্তি মৃত্যুদণ্ডে ফাঁসির রজ্জুতে।